প্রবাহ

প্রথম বর্ষ | প্রথম সংখ্যা | ২০২০

NARASINHA DUTT COLLEGE

129, Belilious Road, Howrah-711101

প্রবাহ

প্রথম বর্ষ | প্রথম সংখ্যা | ২০২০

NARASINHA DUTT COLLEGE
129, Belilious Road, Howrah-711101
Phone: +913326438049, Fax: +913326434259
Email: principal@narasinhaduttcollege.edu.in

প্রবাহ (PRABAHA)
বার্ষিক কলেজ পত্রিকা

প্রথম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর, ২০২০

সম্পাদক :
ড: সোমা বন্দোপাধ্যায়
অধ্যক্ষা, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া

উপদেষ্টামণ্ডলী :
ড: কুন্তল চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক সঞ্জীব কুমার সাহা
অধ্যাপক বর্ণালী ঘোষদস্তিদার
ড: অমল সরকার
অধ্যাপক সিদ্ধার্থ সেন
ড: নীলাদ্রি দে
অধ্যাপক মৌমিতা ধর (দে)
ড: প্রদীপ কুমার তপস্বী
অধ্যাপক শুভাশীষ চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ভাবনায় :
ড: শম্পা সরকার
অধ্যাপক, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া

প্রকাশক :
ড: সোমা বন্দোপাধ্যায়
অধ্যক্ষা, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া

অলংকরণ:
ফাইন ডট্‌স, কলকাতা ৩১
Email: finedots15@gmail.com

আমাদের কথা...

নরসিংহ দত্ত কলেজ — শতাব্দী প্রাচীন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পার হয়ে এসেছে দীর্ঘ পথ। স্বমহিমায় উজ্জ্বল এই প্রতিষ্ঠান উচ্চমানের শিক্ষা, উদার সংস্কৃতি আর উন্মুক্ত চিন্তার নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। এই প্রতিষ্ঠানের সুদীর্ঘ যাত্রাপথ গোলাপের পাপড়ির মত মসৃণ নয়। শ্বেতশুভ্র গোলাপের পাপড়িতে ছাপ রেখেছে প্রভূত বাধাবিঘ্নের স্মৃতিচিহ্ন। এবড়ো খেবড়ো পাথুরে রাস্তা কখনো রোধ করতে পারেনি এই প্রতিষ্ঠানের আবহমান গতি। আগামী দিনেও এই গতিপ্রবাহ বজায় রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর। এই প্রতিষ্ঠান শুধু একটি প্রতিষ্ঠান নয়, একটি যৌথ পরিবার যেখানে প্রত্যেক সদস্য সমান গুরুত্ব পায়। এই পরিবারের প্রবীণ, নবীন সমস্ত সদস্যের মধ্যে সৃষ্টিশীলতার যে গুপ্তধন লুকিয়ে আছে তার সন্ধানেই প্রতিষ্ঠানের এই প্রয়াস — **প্রবাহ**।

এবড়ো খেবড়ো পাথরগুলো,
বারুদ ঠাসে তোর বুকে
চোখ থেকে তোর ঝরিয়ে আগুন,
ছুটে চলিস তাল ঠুকে।

প্রবাহে তোর পাথর গড়ায়
থামায় তোকে সাধ্যি কার?
ফণায় নাচাস হীরের কণা,
পাথর করিস গোলাকার।

হুংকারে তোর চমকে ওঠে
ধূম পাহাড় আর নীল আকাশ,
গর্জন তোর ছড়ায় মাতন,
বার্তা নিয়ে যায় বাতাস।

রুখতে আসা দানবগুলো
অবোধ শিশু তোর কাছে
আয় দেখি এই গতি থামায়,
এমন সাহস কার আছে?

সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যক্ষা, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া

সূচিপত্র

আমরা কি আমাদের পূর্বপুরুষের চেয়ে ভালো আছি? ৭
সাহিত্য রায়

কাফকার পৃথিবী ৮
সৌরীশ ঘোষ

বাংলা ভাষা নিয়ে ভাবনা ও
কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কাজের বাংলা' ১০
বর্ণালী ঘোষ দস্তিদার

এ কেমন পৃথিবী ১২
শঙ্কর কুমার সান্যাল

ইচ্ছা ১৪
অঙ্কুশ পাল

অবনীর প্রতি ১৪
সৌমিলী রায়চৌধুরী

আয়না-মানুষ ১৪
রাজীব পাত্র

দেশ ১৫
সুস্মিতা ঘোষ

আগমনী ১৫
অরিজিৎ সাঁতরা

অশ্রুজল ১৫
সন্ধ্যা নস্কর

প্রস্তর যুগ ১৬
কুশল বিশ্বাস

দূরত্ব ১৬
প্রিয়া দাস

ইচ্ছে-ডানা ১৭
চিরঞ্জিত কোলে

একলা বৃষ্টি ১৭
ঈশিতা গুছাইত

নেবুর পাতায় করমচা ১৮
অর্ক চট্টোপাধ্যায়

একলা অনুভূতি ১৮
প্রীতি ঘোষ

স্বাধীনতার স্বাদ ১৯
দীপান্বিতা ধাড়া

সেই ভুতুড়ে জাহাজটা ১৯
সৌমিত্র কুন্ডু

মোহের মোহনা ২০
অনির্বাণ দলুই

ইচ্ছেগুলো ২২
সায়ক ভট্টাচার্য

দলছুট ২৪
শর্মিষ্ঠা রীত

গুরু কৃপায় গুরুদংমার ২৫
সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়

চারখোলের চার রাত ২৯
অংশুমান সরকার

অভিশপ্ত কলম ৩৫
বীরেশ্বর ধানকী

আঁশু ৩৬
সঞ্জীব কুমার সাহা

She is! In search of liberty ৪৪
Subarna Chongder

Apocalypse and After: Balancing
the Virtual and the Real ৪৫
Kuntal Chattopadhyay

The Lockdown ৪৮
Saurav Ghosh

Life ৪৮
Mithun Hazra

Self ৪৯
Riya Ghosh

Shift ৪৯
Ritwik Bag

Companion ৫০
Anuska Mukherjee

باز غ بہاری کی مقصدی شاعری ৫১
M. Imtiaz Ahmed

আমরা কি আমাদের পূর্বপুরুষের চেয়ে ভালো আছি?

সাহিত্য রায়
তৃতীয় বর্ষ, নৃতত্ত্ব বিভাগ (সাম্মানিক)

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে ইচ্ছা করে, সত্যজিৎ রায়ের লেখা প্রফেসর শঙ্কুর গল্পের টাইম মেশিনে চড়ে দুশো বা তিনশো বছর পিছিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়। আমাদের কাছে আজকের দিনে অপরিহার্য, এমন বহু জিনিসই তখনকার সময়ের ছিল না। আমাদের পূর্বপুরুষরা কীভাবে দিন কাটাত ভাবলে অবাক হতে হয়। ট্রেন বা প্লেন ছিল না। জাহাজপথ ছিল বিপদসঙ্কুল। না ছিল মোটরগাড়ি না ছিল ভালো রাস্তা। ক্যুরিয়র বা ডাকব্যবস্থা শুধু অতীব ধনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। টেলিফোন, মোবাইল, টিভি, ডি.ভি.ডি, ইন্টারনেট ইত্যাদি ছিল অলীক কল্পনা। জিনিসপত্র সবই হাতে তৈরি হত, তাই সংখ্যায় অল্প ছিল। বিদ্যুৎব্যবস্থা না থাকায় সন্ধ্যা থেকেই হ্যারিকেন-বাতি জ্বলত। বিজ্ঞানের অভাবে আধুনিক চিকিৎসা দুর্লভ ছিল এবং মানুষ অজানা রোগের শিকার হত, অকালমৃত্যু ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। যোগ্য ডাক্তার ছিল খুবই কম ও আধুনিক হাসপাতাল, যন্ত্রপাতি এক স্বপ্ন ছিল সাধারণের কাছে। শিক্ষা মূলত বড়োলোকের কুক্ষিগত ছিল। বেশিরভাগ গরীব মানুষ লেখাপড়ার প্রয়াসও করত না কারণ বইয়ের দাম ছিল আকাশছোঁয়া। বিনোদন বলতে ছিল শুধু মেলা, যাত্রা-পালা, নাটক, গান ইত্যাদি। স্বাভাবিকভাবে এখনকার প্রজন্ম মনে করে যে আমাদের পূর্বপুরুষরা একঘেয়েমি জীবন যাপন করত।

বর্তমান সভ্যতার দ্রুত উন্নয়ন মানুষ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে প্রতিদিন আরো উন্নত করছে। পৃথিবীতে পার্থিব সুখের কোনো খামতি নেই। তবুও আমরা কি আজ সত্যিই সুখী ? এই যান্ত্রিক যুগে আমরা ধীরে ধীরে যন্ত্রে পরিণত হচ্ছি। আত্মকেন্দ্রিক হচ্ছি, হারাচ্ছি মনুষ্যত্ববোধ। শিক্ষিত হচ্ছি, তবে বোধ হয় প্রকৃত মানুষ হচ্ছি না। চারপাশে দ্রুত অফারের হট্টগোলে আমরা সর্বদাই অসহিষ্ণু ও 'আরো' পেতে উদ্গ্রীব। আগের দিনের সেই ছোট্টো 'খেলনা' নিয়ে বহুদিন খুশি থাকার জমানা শেষ। হারিয়ে গেছে পুরোনো সময়ের কত খেলা। খেলার মাঠ, পার্ক, ঝিল-পুকুর হারিয়ে যাচ্ছে কংক্রিটের জঙ্গলে, তাই ছোটোদের খেলার জায়গা এখন ঘরে বসে কম্পিউটার গেমস বা মোবাইল ফোন। এর ফলে অনেকেরই ছোটো বয়স থেকে দৃষ্টিশক্তি কমতে শুরু করে এবং এর সাথে দেখা যায় বিভিন্ন ধরণের মস্তিষ্ক ও মানসিক বিকৃতি। 'ওবেসিটি'-তে ভোগা শরীরে অল্প বয়সেই বাসা বাঁধছে হরেক রকম 'লাইফস্টাইল' রোগ। ইন্টারনেট যেমন আজ জীবনকে অনেক সহজ করেছে তেমন তার কিছু খারাপ দিকও আছে। বেশির ভাগ মানুষই এর প্রতি আজ কঠিনভাবে আকৃষ্ট। ফলে বাড়ছে মানবিক ও সামাজিক সংকীর্ণতা। যৌথ পরিবারতন্ত্রের বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিসর্জন হয়ে গিয়েছে অন্যের প্রতি সৌজন্য ও সহমর্মিতা প্রদর্শন ও আত্মত্যাগ। এই প্রজন্মের অনেকেই তাদের মাসতুতো, পিসতুতো, জ্যাঠতুতো ভাইবোন ও এরকম কিছু আত্মীয়দের চেনেই না বা চেনার চেষ্টাও করে না।

ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ-এর যুগে আলাপ হয় নতুন অনেক মানুষের সাথে, তৈরি হয় অনেক বন্ধু, ঠিক এর পাশে হারিয়ে গেছে অনেকেই। সবাই আজ সবার মতো করে খুব ব্যস্ত। আজ একজন উচ্চবিত্ত পর্যন্ত চিন্তিত, তার জমানো অর্থ তার পরিবারের সুরক্ষার জন্য যথেষ্ট কিনা, তাহলে সামান্য চাকুরিজীবী বা ব্যবসায়ীদের মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তাই আজ অনেকেরই জীবন অল্পবয়স থেকেই ওষুধকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে।

জগৎ জুড়ে সমাজবিরোধী ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ আমাদের সন্ত্রস্ত করে রেখেছে। মানুষ চাঁদকে জয় করেছে ও মঙ্গলগ্রহও আজ বিজ্ঞানীদের কাছে অদূরে নয়। আজ আমরা প্রকৃতির সঙ্গে কিছু কিছু বিষয়ে টক্কর দিচ্ছি, তবুও আমরা যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও দারিদ্রকে জয় করতে পারিনি, দূষণ ঘটিয়ে বরং পৃথিবীকে আরও বিপদের পথে ঠেলছি। বিপদটা বুঝছি কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কোনো 'দায়' নিতে আমরা রাজী নই কারণ আমরা শিক্ষিত চতুর। কি জানি এতো অগ্রগতির পরেও আমরা কি সত্যিই আমাদের পূর্বপুরুষদের চেয়ে ভাল আছি? গভীর সংশয় জাগে মনে।

কাফকার পৃথিবী

সৌরীশ ঘোষ

দ্বিতীয় সেমেস্টার, ইংরাজি বিভাগ

'One Morning, as Geogon Samsa was walking up from anxious, dreams he discovered, that in bed he had changed into a monstrous verminous bug' (এক সকালে উঠে গ্রেগর সামসা দেখল সে পোকা হয়ে গেছে) পৃথিবীর হাজারো মানুষকে এই একটি লাইন যুগ যুগ ধরে ভাবনার খোরাক দিয়ে গেছে, যা বর্তমানেও বর্তমান। নোবেলজয়ী সাহিত্যিক গ্রাবিয়েল গার্সিয়া মার্কেস্ আন্দোলিত হয়েছিলেন এই একটি লাইন পড়ে। সমীক্ষা অনুযায়ী বিংশ শতাব্দীতে যে লেখককে নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা যাঁকে নিয়ে নব্বইয়ের দশকের মধ্যে লেখা হয়ে গিয়েছে দশ হাজার বই এবং ১৯৯৬ থেকে ২০১৯ অবধি প্রতি দশ দিনে একটি করে বই লেখা হয়। ফ্রানজ কাফকা। বেঁচে ছিলেন মাত্র একচল্লিশ বছর। যিনি মৃত্যুর আগে তাঁর বন্ধুকে বলেছিলেন তাঁর সব লেখা পুড়িয়ে ফেলতে। ভাগ্যিস তা হয়নি নইলে দুনিয়ে কাঁপানো 'The Metamorphosis', 'The Trial', 'Amerika', 'Leters to Milena' পেতামই না। সাহিত্যে কাফকার প্রভাব এতটাই প্রবল যে একশো জন নোবেল জয়ীর মধ্যে বত্রিশ জনই স্বীকার করেছেন তাদের লেখনী ও সাহিত্য জীবনে কাফকার প্রভাব। বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর সেরা লেখক আলবেয়ার কাম্যু, কোয়েভসি, জাঁ পল সার্ত্রে মার্কেস নির্দ্বিধায় তা স্বীকারও করেছেন।

আমার সাথে কাফকার পরিচয় সাহিত্য নিয়ে নাড়াঘাটার শুরুর দিকে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের 'পোকা' নাটক ও Haruki Murakami-র 'Kafka on the Shore' বইটি থেকে কাফকার লেখা Metamorphosis পড়ি। গত জানুয়ারিতে। বলাই বাহুল্য কাফকার সাহিত্যের মধ্যে যে অদ্ভুত একটা অন্যরকম টান বা অনুভূতি লুকিয়ে রয়েছে সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারি। কাফকার লেখা কোনো রোমান্টিক আবহ সৃষ্টি করে না। বাস্তবের দৈনন্দিন বেঁচে থাকার মধ্যে যে একটা গভীর বিষাদ, অন্ধকারাচ্ছন্নতা, অবসাদগ্রস্ততা, দুঃখ লুকিয়ে রয়েছে, সমাজের প্রতি পরতে যে বিপন্নতার চোরাস্রোত কাজ করছে তাই অনুভব করায়। আমরা যে সত্যিই সুখী নয়, বাস্তবের মাটিতে কতটা একা তা কি আমরা সত্যিই ভাবি? কোনোদিন নিজের মুখোমুখি হয়ে নিজের ভাবনাচিন্তা কাটাছেঁড়া করে দেখি? প্রেম-সংঘাত পেরিয়ে জীবনের চারপাশের গাঢ় কুয়াশাটাকে দেখি?

জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন:

অর্থ নয় কীর্তি নয় সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতর খেলা করে

অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এক বিপন্নতার প্রভাব আছে তা আমরা লক্ষ করি না। জীবনে দুঃখকে প্রতি মুহূর্তে গ্রহণ করার মধ্যেই আনন্দ লুকিয়ে রয়েছে। কাফকার প্রতিটি লেখা বিভিন্ন আঙ্গিকে সেটাই শেখায়।

ফ্রানজ কাফকা বিচ্ছিন্নতাবাদের লেখক (Dante of 20th Century) তাঁর রচনা, বাস্তবতা ও কল্পনার মিশেল করে নায়কেরা হয়ে উঠেছে অ্যান্টিহিরো যারা সামাজিক আমলাতান্ত্রিক শক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরাজিত। 'The Trial', 'The Judgement', 'The Castle', 'Amerika', 'Metamorphosis' প্রত্যেকটি অদ্বিতীয় ও অনন্য।

১৯১২ সালে কাফকার প্রথম গল্পের বই প্রকাশ করেন তিনি। বইটি আটশো কপি ছাপা হয়। যদিও সেই বই লাভের মুখ দেখেনি। বইটি (The Verdict) এগারো কপি বিক্রি হওয়ার পর কাফকা বলেন 'দশখানা কপি আমি নিজেই কিনেছি, বাকি একখানা কে কিনেছেন তা খুব দেখতে ইচ্ছে করছে'। মাত্র নয়টি বড়ো গল্প, তিনটি উপন্যাস, ছোটো গল্প, ডায়েরি ও ধারাবাহিক চিঠি (প্রেমিকা মিলেনা ও বাবাকে লেখা) এই নিয়ে তাঁর সাহিত্যিক জীবন।

ফ্রানজ কাফকা জন্মগ্রহণ করেন প্রাগে। এক সচ্ছল মধ্যবিত্ত ইহুদি ব্যবসায়ী পরিবারে। তাঁর বাবা হারম্যান কাফকা, যিনি ছিলেন পেশায় মাংসবিক্রেতা। ছোটো থেকে চরম ঘেরাটোপ ও বাধা নিষেধের মধ্যে বড়ো হয়ে উঠেছেন তিনি। বাবা, মা কেউই কোনদিন সেভাবে তাঁর কাছের বন্ধু হয়ে উঠতে পারেননি। আরও ছিল তিনবোন। যদিও তারাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে প্রাণ হারান। ফ্রানজ-এর বয়স যখন সাত তখন তার ছোটো দুই ভাই জর্জ ও হাইনরিখ শিশু অবস্থাতেই মারা যান।

কাফকা তাঁর জীবন আরম্ভ করেন বীমা কোম্পানীর একজন এজেন্ট হিসাবে। কাফকার সমকালে প্রাগ্ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। সেই শহরের সাংস্কৃতিক চর্চা ও মানুষজনের জীবনযাত্রা তাঁর উপরে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। এছাড়া কাফকা বরাবরই একজন মনোযোগী পাঠক ছিলেন। নিজের গরজে তিনি শিখেছিলেন তিনখানা ভাষা। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তাঁর বন্ধু ছিলেন ম্যাক্স ব্রড্। তাঁর সারাজীবনের সঙ্গীও ছিলেন এই ম্যাক্স ব্রড্। তিনি ও তাঁর বন্ধু মিলে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনই পড়ে ফেলেন প্লেটোর 'Protagoras' থেকে শুরু করে গুস্তাব ফ্লবেয়ার-এর 'Sentimental Education' অবধি। বিভিন্ন সাহিত্য বিষয়ে তাঁদের আলোচনা চলত দীর্ঘক্ষণ অবধি। তবে দস্তয়েভয়স্কি, ফ্লবেয়ার, গ্রিলপারসার এঁদের

লেখা দ্বারাই সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হন তিনি। পরে তিনি এদের নিজের রক্তের ভাই বলেও চিহ্নিত করতেন। কাফকার প্রথম লেখকজীবন খুব একটু সুখের ছিল না। সকাল ৮.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০টা অবধি টানা পরিশ্রম করে লেখালিখিতে মন দিতে পারছিলেন না। ১৯০৮ সালে কাফকার প্রথম লেখা 'Das Unteil' (literally –The Verdict প্রকাশিত হলেও তাঁর ১৯১৫-তে তাঁর সেরা সাহিত্যকর্ম 'Verwandlung' (The Metamorphosis) প্রকাশিত হয়। নামকরণের ক্ষেত্রে তিনি Ovid-এর থেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছেন বলে মনে করা হয়েছে।

কী সাবলীল ভাবে তিনি একজন মানুষের শারীরিক রূপান্তর আর রূপান্তরের খোলসে সামাজিক রূপান্তরের কথা বলে গেলেন। যে গ্রেগর সামসার (মূল চরিত্র) উপর নির্ভর করেছিল তাঁর পুরো পরিবার সেই তিনিই পরিবারের সকলের কাছে অনীহার পাত্রে পরিণত হলেন। ওভিডের বিখ্যাত মহাকাব্য 'Metamorphosis'-এ যেমন নার্সিসাস হয়ে যান গাছ, জিউস ষাঁড়ে রূপান্তরিত হয়ে মিলিত হন নারীর সাথে তেমনই এও এক পরিবর্তনের গল্প। পুরো লেখা জুড়েই তিনি এনেছেন সমাজের জটিল সমস্যা, নির্মমতা, কৌতুকবোধকে। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চললেও তাঁর লেখায় সরাসরি এসবের কোনো আঁচ পাওয়া যায় না। মানুষের নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতা, অবসাদকেই তিনি এই লেখার মূল থিম হিসেবে তুলে ধরেছেন।

তিনি তাঁর এই লেখার মাধ্যমে আমাদের দৈনন্দিন বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ, থেঁতলে-যাওয়া সুখসন্ধানী, অলস জীবনযাপনকে ঝাঁকুনি দিয়ে গেছেন। নিজস্ব বৃত্তে বন্দী আমরা কী গ্রেগর সামসার মতো নিজেদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন লক্ষ করতে পারি? সে অনুভব করার জন্য পড়তে হবে এই স্বল্পায়তন নভেলা।

যাই হোক, 'Metamorphosis'-এর পরে একে একে প্রকাশিত হয় 'In the Penal Colony', 'A Hunger Artist' এর মতো কালজয়ী রচনা। ১৯১৭ সালে কাফকার যক্ষ্মা ধরা পড়ে। তখন এর কোনো চিকিৎসা না থাকায় ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নেন কাফকা। প্রাগের একটি বদ্ধ গলির শেষপ্রান্তের ঘুপচি বাড়িতে দিন কাটছিল তাঁর। নিজেকে সবসময় লুকিয়ে রাখতে চাইতেন তিনি। রোজ গভীর রাতে হাঁটতে বেরোতেন একা একা। বিয়ে করেননি তিনি। অনেক নারীর সংস্পর্শে এলেও কাউকে বাঁধতে পারেননি নিজের সাথে। তার প্রথম প্রেমিকা ফেলিস বাউয়ার। তাকে কম করে কাফকা পাঁচশো চিঠি লিখেছেন। যে চিঠির সংকলন নিয়ে 'Letters to Felice' নামে বই বেরোয়। ১৯২০-তে যক্ষ্মা ধরা পড়ার পর তিনি মিলেনা জেসেন্সকা নামে এক চেক সাংবাদিকের প্রেমে পড়েন। মিলেনাকেও লিখেছেন শয়ে শয়ে চিঠি। তা নিয়েও 'Letters to Milena' নামে সংকলন বেরোয়।

তাঁর শেষ প্রেমিকা ছিলেন ডোরা ডিয়ামান্ট। জীবনের শেষদিকে তাঁরা ঠিক করেন প্যালেস্টাইনে গিয়ে সংসার পাতবেন। রেস্টুরেন্ট খুলে ডোরা রান্না করবেন তিনি হবেন ওয়েটার। কিন্তু সে সুযোগটুকু তিনি পেলেন না। নিজের লেখার একটা বড়ো অংশ পুড়িয়ে দিলেন। বাকি যা ছিল তাও তাঁর বন্ধু ব্রডকে বললেন পুড়িয়ে দিতে। ১৯২৪ সালের ৩ জুন কাফকা মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ম্যাক্স ব্রড তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করে প্রকাশ করেন 'The Trial', 'Letters to Milena', 'The Amerika' তুমুল জনপ্রিয় হয় সেসব লেখা। সাহিত্যের এক নতুন ধারা জন্ম নেয়, যার নাম 'Kaf Kaesque'। এভাবেই নিজের সমস্ত কিছু পুড়িয়ে দিতে চাওয়া ব্যক্তির নামে রচিত হয়েছে শত সহস্র বই। তিনি আজও স্বমহিমায় বেঁচে পৃথিবীর সাহিত্যবোদ্ধা, সাহিত্য গবেষকদের কাছে।

> সত্যের জন্য সব কিছুকে ত্যাগ করা চলে, কিন্তু কোন কিছুর জন্য সত্যকে বর্জন করা চলে না।
>
> — *স্বামী বিবেকানন্দ*

বাংলা ভাষা নিয়ে ভাবনা ও কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কাজের বাংলা'

বর্ণালী ঘোষ দস্তিদার
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

"বাংলা ভাষায় এমনই এক অনুপম রহস্য লুকিয়ে আছে যে এই ভাষাতেই 'আসি' বলেও টুক করে চলে যাওয়া যায় —" কথাটি অনেকদিন আগে বলেছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সম্প্রতি শতবর্ষ পূর্ণ করেছেন কবি। আর বাংলা ভাষার মনোযোগী পড়ুয়াদের জন্য তো বটেই ছাত্র - শিক্ষক - গবেষক - সমীক্ষক - ইতিহাসবিদ - সমাজবিজ্ঞানী সকলের জন্যই যে কতো অসংখ্য মণিমানিক্য রেখে গেছেন তার হিসেব নেই।

এদিকে বাঙালি হয়েও শতকরা আশিভাগ বাঙালির বাংলা ভাষার প্রতি দরদ যে কতোটা আসল আর কতোটা মেকি সেটা একটু নিরপেক্ষ আত্মসমীক্ষা করলেই বোঝা যায়। বচ্ছরকার হাতেগোনা কয়েকটি দিন শুধু বাঙালিয়ানা নিয়ে আদিখ্যেতা করার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে আছে। বাকি সব দিনই বাঙালি হয় ঘোর সাহেব, নয় উত্তরভারতীয় সংস্কৃতির গোলাম। আসলে গোলামি আমাদের রক্তে। আগে ছিলাম বৃটিশের, এখন হয়েছি হিন্দি বলয়ের। প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি বা মে মাস এলেই তাই বাংলা ভাষার অন্যতম সেরা কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাংলা ভাষার জন্য গভীর চিন্তা- ভাবনা, লেখাজোখা, এ ভাষার উন্নতি আর প্রসারের জন্য নানা আন্তরিক উদ্যোগের কথা মনে পড়ে। ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখটি বিশেষ দিন ভাষাদিবসের জন্য। আবার এই ফেব্রুয়ারির ১২ তারিখেই জন্মেছিলেন অন্যতম শক্তিমান কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কী চমৎকার করে নিজের জন্মক্ষণটির বর্ণনা দিয়েছেন.........

'একেবারে শীতের শেষদিন
পাতা নেই গাছে
দুটি ঠোঁট শব্দ তুলে অন্য দুটি ঠোঁটে
বলে ওঠে; মনে নেই? কাল মধুমাস, (কাল মধুমাস)

পরিসংখ্যান বলছে এই বিশ্বের পঁচিশ কোটি মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। আর বাংলা ভাষার গভীরে যাঁরা একবার ডুব দিয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন যে এই ভাষায় রত্নরাজির শেষ নেই। বাংলা ভাষার নগণ্য এক ছাত্রী হিসেবে আমার তো মনে হয় অতিদীর্ঘজীবী কোনো মানুষের পক্ষেও এক জীবনে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের সবটুকু পড়ে ওঠা সম্ভব নয়। বাংলা ভাষার এই হাজার বছরেরও পুরোনো বহমান স্রোতের ওপর যুগে যুগে আঘাত কম আসেনি। কিন্তু উদার বাঙালি তাকে "আঘাত" মনে না করে "আগমন" মনে করেছে। দেখতে দেখতে তার সংস্কৃত-প্রাকৃতের দীন ভান্ডার উপচে উঠেছে আরবি-ফারসি-পর্তুগিজ- ডাচ- ওলন্দাজ-ফরাসি-ইংরেজি অজস্র অতিথি ও আগন্তুক শব্দে।

কিন্তু তবু কেন বাঙালির প্রতিদিনের যাপনে, দপ্তরিখানায়, অফিস-কাছারি আদালতে চিঠিপত্রে বাংলা অচ্ছুৎ? লিখেছিলেন "ইংরেজের শাসন থেকে মুক্তি পেলেও আমাদের বাক্যালাপে ইংরেজির শাসন আজও যায়নি। সটান বাংলায় ভাবতে এখনও আমরা অভ্যস্ত হতে পারিনি বলে কথায় কথায় ইংরেজি বাক্যবন্ধ এসে যায়।" (কাজের বাংলা)

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় শতবর্ষ পরেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছেন কারণ, বাংলা ভাষার জন্য তাঁর অন্তরের দরদ শুধু বাইরের দেখনদারি ছিল না, ছিল ভেতরের পবিত্র নির্মল এক আবেগ, যেমন সাধারণত হয় মায়ের প্রতি সন্তানের। দিল্লিতে ১৯৭৫ সালে হয়েছিল আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন। সুভাষ সেখানে আমন্ত্রিত ভারতীয় প্রতিনিধি। মঞ্চে দাঁড়িয়ে সটান বললেন, "আমি ইংরেজি জানিনা, বাংলায় বলবো।" একে নিছক মাতৃভাষা প্রেম বললে বোধহয় সবটুকু মাপা যায় না। "বাংলায় বলবো" "বাংলায় লিখবো" ভাষার জন্য এমন অহংকৃত উচ্চারণ 'বাংলাদেশে' পাওয়া গেলেও এদেশে বড়ো একটা দেখা যায় না। এরপর? লেখক অত্যন্ত শ্লাঘার সঙ্গেই তাঁর নিজস্ব মসৃণ প্রাঞ্জল বাংলা গদ্যে লেখা ভাষণখানি পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে সহজ ইংরেজিতে ভাষণটি অনুবাদ করলেন প্রেমচন্দের পুত্র অমৃত রাই।

নিজের জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সুভাষ জেনেছিলেন — "যে ভাষার খেতে দেওয়ার মুরোদ নেই তা মানুষের কাছে অনাদৃতই থাকবে। ক্ষমতার আকাশগঙ্গা যেহেতু শিবের জটায় এখন ও বাঁধা পড়ে আছে তাকে মাটিতে নামিয়ে সহস্রধারায় ছড়িয়ে না দিলে ভাষার সম্মান নেই।" 'কাজের বাংলা' (২০০২)।

এখানেই দৈনন্দিন ব্যবহারের বাংলাভাষা নিয়ে তাঁর ভাবনা-চিন্তার গোড়ার কথাগুলি জানিয়ে ছিলেন।

এক) "কোনো ভাষাকে কাজে লাগালে তবেই সে ভাষা কাজের হয়। কাজে না লাগানোর ফলেই পৃথিবীর অনেক ভাষা লুপ্ত হয়ে গেছে। কাজেই বাংলাভাষার বাঁচামরা নিভর করছে আমরা তাকে কাজে লাগাতে পারছি কি পারছি না তার ওপর।"

দুই) "সরকারি কাজের বাংলা হবে সাধারণ মানুষের মুখের কাছাকাছি। এখন যে আর রাজা-প্রজা বলে কিছু নেই এটা ভালো করে বুঝে নিয়ে লেখার পুরোনো ঢংগুলোও বদলাতে হবে।"

তিন) "ইংরেজিকে সামনে রেখে তার পায়ে পায়ে চলতে চাওয়াই

হয়েছে আমাদের কাল। ইংরেজি আর বাংলা দুটো আলাদা ভাষা। নিয়মকানুনও আলাদা। বাংলার ওপর ইংরেজির জোর খাটানো চলবে না। মনের যে ভাবটি বাইরে প্রকাশ করবে সেটা যেন ধোঁয়াটে না হয়। ঘোরপ্যাঁচ না থাকে। এমনভাবে বলবো যাতে কাজ হয়।''

বাংলা ভাষার ফুসফুসে মগজে রক্ত জোগাতে, তাকে কাজের বাজারে উপযুক্ত জোরালো চাঙ্গা করে তুলতে সুভাষের স্বপ্ন কল্পনা শ্রমের অন্ত ছিল না। লিখেছিলেন, ''বাংলা ব্যাকরণ এখনও মোটামুটি সংস্কৃতের হাত ধরা। কিন্তু সংস্কৃতের আঁতুড়ঘরে জন্মালেও বাংলা একটা আলাদা ভাষা। তার আছে নিজস্ব সব নিয়মকানুন। নিজস্ব চালচলন।'' (কাজের বাংলা)

ষাটের দশকের শেষদিকে পুবপাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) ভাষা আন্দোলনের (১৯৫২) প্রেরণায় গড়েছিলেন ''বাংলা প্রবর্তন সমিতি''। এরপর সরকারি কাজে বাংলার দাবি নিয়ে সভা সমিতি মিটিং মিছিল দাবিপত্র পেশ কম করেননি। রাজশেখর বসু, সুনীতি চাটুজ্যে, সুকুমার সেনদের সভাপতির পদে বসিয়ে 'পরিভাষা সমিতি' ও তৈরি হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনের এক গোঁ.... ''বাংলা ভাষার তেমন কোমরের জোর আছে কি?''

মোদ্দা কথাটি সুভাষ বুঝেছিলেন। পতাকার রং বদলালেও বাংলা ভাষার দিন বদলায় না। ভোলও বদলায় না। তাকে প্রজন্ম পরম্পরায় দীনদুঃখী পরমুখাপেক্ষী ঘরের কোণে পাপোশের মতো পড়ে থাকতে হয়।

আসল কথা বাংলা যে এলিট ভাষাই নয়। ব্রাহ্মণ্যবাদের তাড়া খেয়ে উচ্চবর্গীয়দের আড়ালে প্রান্তিক সমাজে দলিত অন্ত্যজদের বুকে আর মুখে তৈরি হয়েছিল যে ভাষা তার গা থেকে নীচুজাতের গন্ধ মুছে ফেলা কি অতোই সহজ? খেলো ইংরেজিরও সমাজে যে কদর যে বাজারদর আছে দ্বিগুণ কব্জির জোরওয়ালা শক্তিশালী বাংলা ভাষারও সেই সম্মান সেই মর্যাদা নেই। তাই নানা অজুহাতে বঙ্গের বুকে বাঙালির মুখেও বাংলা ব্রাত্য, মন্ত্রহীন। কখনো উপযুক্ত পরিভাষা নেই, কখনও পরিকাঠামো নেই এমনিই নানা অছিলায়, লাখো বাহানায় ভাষার জগতে বাংলাকে দুয়োরানি হয়েই থাকতে হয়।

ভাষা রাজ্যের এই সাম্রাজ্যবাদী বৈষম্য মানতে রাজি ছিলেন না সুভাষ। ''কাজের বাংলা'' য় লিখেছিলেন, ''সরকারি কাজ আর আইন আদালত ছাড়াও বাংলাকে কাজে লাগানোর রাস্তা আরও খুলে দিতে হবে। যেমন অনুবাদক, দোভাষী, সিনেমা-টিভিতে বাংলায় ডাবিং, চোখে পড়ানো কানে তোলানো বিজ্ঞাপন, ওষুধ আর পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে তথ্যযুক্ত লেখা।''

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন মূলত কবি। কবিতার মাধ্যমে রাজনৈতিক ভাষ্যকারও বটে। কিন্তু সেইসঙ্গে ছিলেন কৃতি গদ্যকার, শক্তিমান অনুবাদকও। ভাষাতাত্ত্বিক না হয়েও মাতৃভাষার ব্যবহারিক রূপ, ছিরিছাঁদ নিয়ে ভেবেছেন আজীবন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ''শব্দ তৈরির ক্ষেত্রে বাংলাকে সংস্কৃতের আশ্রয় নিতেই হয়।'' (বাংলাভাষা পরিচয় ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৪৩) সুভাষ এই মতকে মান্যতা দিয়েও বলেছিলেন, বাংলাভাষার শরীর থেকে ''সংস্কৃতের ভার'' হালকা করতে হবে। ''বড়ো বড়ো সমাস আমাদের ধাতে সয় না।'' ''কৃতাঞ্জলিপুটে'' বা ''নবজলধরপটল'' কী দরকার? ''জোড়হস্তে'' বা ''নবমেঘমালা'' বললে মন্দ কি? সুভাষ মুখোপাধ্যায় সারাজীবন অনবরতই বলে গেছেন, লেখার ভাষার আদলটা হবে শৌখিন, কেতাদুরস্ত নয়। ঘরোয়া, আটপৌরে। খটোমটো পরিভাষা বর্জন করে সহজ ব্যাখ্যায় লিখছেন – ''সে যুগে মেয়েরা ছিল সমাজের পান্ডা–'' 'মাতৃতন্ত্র' শব্দটি পরিহার করলেন। তাঁর লেখায় 'উপাধ্যায়' হচ্ছে 'ওঝা'। গ্রামীণ বাগ্‌ধারাগুলির অমিত শক্তির কথা মাথায় রেখে অবলীলায় লিখছেন 'অলপ্পেয়ে', 'অলবড্যে', 'অনুরোধে ঢেঁকি গেলা', 'গায়ের ঝাল ঝাড়া', 'নিজের কোলে ঝোল টানা', 'ছড়িয়ে-ছিটিয়ে', 'কুড়িয়ে-বাড়িয়ে', 'মিলিয়ে-মিশিয়ে', 'খুঁজে-পেতে'......এমন হরেক চমকপ্রদ বাগ্‌গুচ্ছ। মুখের বুলির ব্যাপারে সুভাষ ছিলেন অনেকটাই আপোসপন্থী। হালকা চালের সহজ সরল শব্দ পছন্দ করেছেন। যে সমস্ত ইংরেজি শব্দ বাংলা ভাষায় নিয়ত ব্যবহারে প্রায় বাংলাই হয়ে গেছে, যেমন চেয়ার, টেবিল, পেন সেসব শব্দ নিয়ে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু ইংরেজি জানা বাঙালি ভদ্রলোকদের অকারণ ইংরেজি বলার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন উন্নাসিকতা — যা তাঁর চরম অপছন্দ ছিল। আবার বলছেন ''ইংরেজি ঠেকাতে গিয়ে গোবরজলে ধোয়া বিশুদ্ধ বাংলা যেন আমাদের পেড়ে না ফেলে।'' চেয়েছিলেন, ''মাছিমারা কেরানি কমিয়ে মস্তিস্কবান অনুবাদক।'' ''এতদ্বারা জানানো যাইতেছে'' বা ''অনুমত্যনুসারে'' র মতো বাঁধাগতের ভারিক্কি বিজ্ঞপ্তির বদলে চেয়েছিলেন সহজ কথায় কিছু।

ভেবেছিলেন বাংলা বানান সম্পর্কেও। লিখেছিলেন — ''বাংলা বানানে অরাজকতা ভীষণ। অথচ বইপত্রের প্রকাশক, স্কুল-কলেজের শিক্ষক, নানা বিদ্যার বিদ্বজ্জনদের সংস্থা আছে। দেশ আর দশের স্বার্থে কেন তাঁরা একটা সর্বসম্মত বানানবিধি গড়ে তুলতে পারছেন না?'' (কাজের বাংলা)। উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন, ''ভাষা ব্যবহারও যে যার মর্জিমতো করে চলেছেন। এই জেদাজেদি আর অবনিবনা বাংলা ভাষার ঐক্যে প্রতিদিন ফাটল ধরাচ্ছে —'' (কাজের বাংলা)।

বাংলা ভাষার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান নিয়ে যে অসন্তোষ কবির মনে জমা হয়েছিল তার অন্তত বিশ-পঁচিশ বছর কেটে গেছে। নদে-কলকাতার খাঁটি ইডিয়মওয়ালা কবি সুভাষের সেই মিষ্টি শ্লোক থেকে প্রসাদগুণ আয়ত্ত করা দূর অস্ত, বাঙালি যেন ক্রমেই দূরে ঠেলে পগার পার করতে চাইছে তার মুখের ভাষা, তার পায়ের তলার মাটি আর অন্তরঙ্গ মানুষটিকেও।

এ কেমন পৃথিবী

শঙ্কর কুমার সান্যাল
সদস্য, IQAC

''সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে
শোনো শোনো পিতা
কহো কানে কানে শুনাও
প্রাণে প্রাণে মঙ্গলবারতা।''

সমাজে বিবর্তনের ধারা চিরন্তন। পুরাতন সংস্কার ভেঙে নতুন সংস্কার জায়গা করে নেয়। চলমান শতাব্দীর বিশিষ্টতার ধারা বহন করে মানুষের স্বভাব চিন্তা ও কর্ম পরিবর্তিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে লক্ষ্য করেছি সময়ের তালের চেয়ে জীবনযাত্রার দ্রুত বদল ঘটেছে। কঠোর কঠিন জীবন সংগ্রাম, সম্পর্কের টানা পোড়েনে যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানবজীবন সংকীর্ণ হতে হতে জীবন-যাপনের গন্ডীকে ছোট করে ফেলতে লাগলো। চিঠিপত্রের আদান-প্রদান দূরকে আপন করে নেওয়ার মধ্যে কত মধুর একটা ব্যাপার ছিল, প্রাণের ছোঁয়া ছিল, তা মোবাইল ফোন আসতেই উধাও হয়ে গেল। আত্মীয় পরিজন বন্ধু-বান্ধবের সাথে সেই সখ্যতা ফোনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হতে থাকলো। পরে এলো হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার, ফেসবুক। কথাবার্তা হয়ে গেল আরো সংক্ষিপ্ত। দু-চার কথা যা ছিল, তাও হল বন্ধ, সংক্ষিপ্ত মেসেজের মাধ্যমে কাজ সারা হয়ে যাচ্ছে। মানুষে মানুষে প্রাণখোলা মেলামেশা সবই যেন ধীরে ধীরে শিথিল হতে লাগলো। ফলে ভালো-মন্দের বিচার ক্ষমতা সীমিত হতে হতে আর দ্রুত জীবন-যাপনের অভ্যাস কতিপয় ক্ষমতাহীন ও ক্ষমতাবান মানুষকে সহজেই ভ্রষ্টাচার ও দুর্নীতির দিকে নিয়ে চলতে থাকলো। স্বভাবতই শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, রাজনীতি — মানুষের পরিকাঠামো ভেঙে পড়তে থাকলো। অন্যদিকে আর্থিক উন্নতির প্রতিযোগিতার দৌড়ে মানুষ প্রকৃতিকে যথেচ্ছ ব্যবহার করার ফলে জল, জঙ্গল, জমি, বায়ু, শব্দ সমস্ত প্রকৃতি বিনষ্ট হতে থাকলো। প্রকৃতির প্রতিষেধক ক্ষমতা ধ্বংসের পথে এগিয়ে চললো। এর ফল সুনামী, আমফান, ভুমিকম্প, তাপপ্রবাহ, বন্যা, ফনী ঝড়, পাহাড়ে ধস এবং বরফ-গলন, জঙ্গলে আগুন আরো কত কি।

গান্ধীজী চেয়েছিলেন ভারতবর্ষকে সেইভাবে গঠন করতে যেখানে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ পরিপূর্ণ সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করবে। দেশগঠনে দরিদ্রতম মানুষটিরও মতামতের যথেষ্ট মূল্য থাকবে। তিনি চেয়েছিলেন সকল মানুষকে যতদুর সম্ভব স্বাধীন ও স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে। ভারতীয় সনাতন ধর্ম-সংস্কৃতি-কৃষ্টির প্রতি আস্থাবান গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন 'ইশোভাস্যম্ ইদম্ সর্বম্', 'তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জিতা', 'মাগ্রধ কশ্যোশোভিত ধনম্' অর্থাৎ সব কিছুই ঈশ্বরের, যা কিছু আমরা ভোগ করছি, সব তাঁরই দান, আমরা অপরের জিনিষ অনধিকারে ভোগ করবো না। অন্যভাবে গান্ধীজীর ভাবনায় 'অন্ত্যোদয়' যাকে ইংরাজীতে বলা হয় 'Unto the Last' অর্থাৎ সবার নীচে সবার পিছে সবহারাদের মাঝে আমাদের থাকতে হবে। সেই দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শে সমাজ গঠিত হলে দরিদ্র মানুষের মুক্তি অনেকদূর কার্যকর হওয়া সম্ভব ছিল। তিনি আরও চেয়েছিলেন গ্লোবাল ভিলেজ। অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের ওপর সামঞ্জস্য রেখে পার্থিব সম্পদ সকলে সমানভাবে ভোগ করবে। কিন্তু গান্ধীজী ও অন্যান্য মহাপুরুষদের দেখানো পথ আমরা অনুসরণ করতে পারি নি। ফলে সমাজে তিন শ্রেণীর মানুষ বিভাজিত হয়েছে। ধনী, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত। স্বভাবতই জীবন যুদ্ধের লড়াই-এ ক্ষমতাবান ধনী শ্রেণীকে আরো ধনী, আরো ক্ষমতাভোগী হতে দেখা গেল। সমাজে অবাধ প্রতিযোগিতার রন্ধ্রপথে শোষণ বল্গাহীন হয়ে পড়ে।

বিশ্বে অনেক সমাজ সংস্কারক, মহান আত্মা অনুভব করেছিলেন এবং চেষ্টাও করেছিলেন সেইভাবে সমাজকে, দেশকে গঠন করতে। প্রসঙ্গত স্বামী বিবেকানন্দের কথা মনে পড়ে — তিনি বিশ্বাস করতেন 'জাতিভেদ দূর করতে হলে সামাজিক অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন এবং দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক প্রণালীর ধ্বংসসাধন একান্ত প্রয়োজন'।

ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকেই বর্ণিত আছে, 'এই চরাচরে যা কিছু বিদ্যমান তার সব কিছুই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত; তুমি ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, অপরের ধনে লোভ করবে না'। গান্ধীজীও ঠিক এমনি চিন্তা করেছিলেন 'বিশ্বে সকলের প্রয়োজন মেটাবার সব কিছুই আছে, কিন্তু সকলের লোভ মেটাবার জন্য যথেষ্ট নেই'।

সেই সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীতে যে সকল জীব সৃষ্টি করে পাঠিয়েছিলেন, তার মধ্যে মানুষ হল শ্রেষ্ঠ জীব। সকল বোধবুদ্ধি, বিচারশক্তি দিয়ে তাকেই বিশ্বপরিচালন ক্ষমতার অধিকারী করেছিলেন। কিন্তু তিনি হতাশ। তাঁর সৃষ্টি করা সুন্দর পৃথিবীকে মনুষ্যজীব ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে পার্থিব সমস্ত বস্তুর অপব্যবহার করে। ভ্রষ্টাচার, দুর্নীতিতে মানুষের মন ও কর্ম নিমজ্জিত। মহান আত্মাদের দেখানো পথ অনুসরণ করার চেষ্টা করে নি। সৃষ্টিকর্তা তাই কঠোর কঠিন সিদ্ধান্ত বাধ্য হন মাঝে মাঝে। রবীন্দ্রনাথের কথায়:

'নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।'

ইতিমধ্যে বিশ্বে হঠাৎ এলো অতিমারী করোনা ভাইরাস। জীবনের দাম গেল কমে। হঠাৎ ভাইরাসের আক্রমণে মানুষের জীবন আত্মা

ছেড়ে হাওয়ার মত ক্রমান্বয়ে বিদায় নিতে শুরু করলো সারা বিশ্বময়। শুধু তাই নয়, ছোট হয়ে আসা পরিবার বাবা-মা-সন্তান-সন্ততির সম্পর্কের মধ্যে অতর্কিতে লাগলো ভাঙন। প্রাণভয়ে নিজের নিজের জীবন সামলাতে, প্রত্যেকে নিজের গন্ডী বুঝে নিতে থাকলো। অতিমারী নষ্ট করে দিল মানুষের মানবিকতা। বিশ্বের উন্নত বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীরাও আজ সংকটে, সঠিক পথের সন্ধান অর্থাৎ প্রতিদিন নব নব ফরমান জারি হচ্ছে অথচ নিষ্কৃতির উপায় আজও অনাবিষ্কৃত। তাই বলি —

ঈশ্বর! 'সবকিছু নিয়ে গেলে যা দিয়েছিলে,
আনন্দ হাসি গান সব তুমি নিলে'।

সৃষ্টিকর্তা বোধহয় তাঁর পৃথিবীকে সুন্দরভাবে সাজাতে বদ্ধ পরিকর। পুরাতন যা কিছু সমস্তকে বাদ দিতে চান। তাই হয়তো এই অতিমারী, এত ঘন ঘন দুর্যোগের ঘনঘটা, দুরন্ত ঘূর্ণীর আসা-যাওয়া।

কেবলই মনে হচ্ছে বিশ্বকবির লাইন ক'টি — 'স্বার্থের বন্ধনে জর্জর হয়ে, রিপুর আঘাতে আহত হয়ে, এই যে আমরা প্রত্যেকে পাশের লোককে আঘাত করছি ও আঘাত পাচ্ছি - সেই প্রত্যেক আমি-র ক্রন্দন ধ্বনি একটা ভয়ানক বিশ্বযজ্ঞের মধ্যে সকল মানুষের প্রার্থনারূপে রক্তস্রোতে গর্জিত হয়ে উঠছে। মা মা হিংসিঃ। মরছে মানুষ, বাঁচাও তাকে। কে বাঁচাবে? পিতা নোহসি।...'

তাই এই দুঃসময়ে আমাদের প্রার্থনা হোক —

'কি হবে গতি বিশ্বপতি
শান্তি কোথা আছে
তোমারে দাও আশা পুরাও
তুমি এসো কাছে।'

আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন সর্বাগ্রে। আসুন সমবেত সুরে বলি —

'অসত মা সদগময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর মা মৃত্যুংগময়।'

জড়তা হতে আমাদের সত্যে নিয়ে যাও।
মূঢ়তা হতে আমাদের জ্ঞানে নিয়ে যাও।
মৃত্যুর খন্ডতা হতে আমাদের অমৃতে নিয়ে যাও।

লেখক - সভাপতি, হরিজন সেবক সংঘ (১৯৩২ সালে মহাত্মা গান্ধী প্রতিষ্ঠিত), ঘুসুড়ি, হাওড়া

মনুষ্যত্বের শিক্ষাটাই চরম শিক্ষা,
আর সমস্তই তার অধীন।

— *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

ইচ্ছা

অঙ্কুশ পাল
স্নাতকোত্তর, দ্বিতীয় বর্ষ, ইংরেজি বিভাগ

যে বাঁকটা এলে টাওয়ার পাওয়া যায় না,
তুমি তখনই ফোন করো;
প্লেটো বলেছিলেন,
কবিরা বাস্তব থেকে দ্বিগুণ দুরে থাকে,
অ্যারিস্টটল বিশ্বাস করেন নি,
ইচ্ছা থেকে উপায় বের করেছিলেন।
রবীন্দ্র সরোবর থেকে সুভাষ সরোবরের মাঝে
ভ্যান গগ থেকে গনেশ হালুই অবধি
হেলেন অফ ট্রয় থেকে ক্লিওপাট্রার মধ্যে
পূর্ণিমার চাঁদ আর ঝলসানো রুটির তফাতে
তুমি ফিরে ফিরে এসেছো প্রত্যেকবার।
শুধু অচেনা হওয়া চেনা মুখ
সিঁড়ির বাঁকে দেখা হলে আর হাসে না।

অবনীর প্রতি

সৌমিলী রায়চৌধুরী
তৃতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

কলকাতা আজও বদলায় নি,
এখনো কবিতা পড়ে।
অবনী আজও বাড়ী ফেরে নি,
স্মৃতি তার ঘরে রোজ কড়া নাড়ে।
অবনীর সাথে দেখা হলে বলব,
বারোমাস আর বৃষ্টি পড়ে না এখন;
নিম্নচাপই বর্ষা আনে শহরে।
নালিঘাস আর পাওয়া যায় না,
পঙ্কিলতা আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে রাখে।
এখনো এখানে মনখারাপ হয়,
স্বপ্নগুলো রোজ নীলামে ওঠে
আবেশ আজও সুখ কিনতে গিয়ে
সস্তা দরে দুঃখ নিয়ে ফেরে।

আয়না-মানুষ

রাজীব পাত্র
তৃতীয় বর্ষ, সংস্কৃত বিভাগ

কী আছে ওই সামান্য কাচটায়?
ও তো শুধুই কোনো এক লাল মেঝে
বা ঝকঝকে পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে-থাকা
নীরব নিশ্চুপ বস্তু।

ও শুধু দিয়েই যায়.....কি পায়?
ওর একটাই কাজ
মানুষের সৌন্দর্যকে তুলে ধরে
চরকি পাকের মতো ঘুরিয়ে
কেউ মনোজ কেউ বা মনস্বী
ওর সার্থকতা এই কর্তব্যপালনেই
কিন্তু তাতেও কি লুকিয়ে নেই
ব্যর্থতা এক কণা?

ও কি পারে ওর ক্ষমতা দিয়ে মানুষের
মনুষ্যত্বের ছবি স্পষ্ট করে তুলতে?
ও কি পারে মানুষের
নগ্নতা স্বার্থপরতা সংকীর্ণতা ক্লীবতার ছায়াগুলো
মেলে ধরতে?

দেশ

সুস্মিতা ঘোষ
তৃতীয় বর্ষ, সংস্কৃত (সাম্মানিক) বিভাগ

হুটারের শব্দে কেঁপে উঠছে গুজরাটের ত্রস্ত জনপদ
গণতন্ত্র নির্বাচন.... সরকার চায় মানুষের রায়
সামরিক বাহিনীর ফ্ল্যাগমার্চে ভরে ওঠে পথ
গুজরাটের মানুষ দেবে পরস্পরের হাতে-হাত

কে আছো হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান?
বনমানুষের দল করুক যতই আস্ফালন তাদের
চিনে নিতে হবে আজ জাহান্নামের দোর
অহিংসাই একমাত্র সত্য - শান্তি
জাতির পিতার এই ছিল মত

সেনাসঙ্ঘ করে রঙ্গ বলছে 'তফাৎ যাও'....
আমরা বলি অহিংসাই শ্রেষ্ঠ বাঁচার পথ
তবু যেন কারা দাঙ্গা ছড়ায়
ফেলে যায় রক্তাক্ত লাশ

আমরা হাসি ভারতবাসী
নিয়েছি যে ঐক্যের শপথ।

আগমনী

অরিজিৎ সাঁতরা
চতুর্থ সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ

আসিল শরৎ হিমের পরশ,
লাগিল ভোরের আকাশে।
আসিল মনে পুজোর আমেজ
মা, আসিবে শরৎকালে।
উঠিল আওয়াজ ঢাকের কাঠি,
মনটা আজি নাচেরে।

অশ্রুজল

সন্ধ্যা নস্কর
চতুর্থ সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ

কিছু কথা ভাবতে ভাবতে
চোখে এল জল,
জলকে বললাম তুই
হঠাৎ কেন বাইরে এলি বল।
জল বলল, চোখটি তোমার
সুখ সৃষ্টির নীড়,
কী করে সইবো বল,
এত কষ্টের ভিড়।

প্রস্তর যুগ

কুশল বিশ্বাস
চতুর্থ সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ

শহরের এক কোণে, আস্তাকুঁড়ে
খুঁজতে গেলাম জীবনের সুর –
দেখলাম গজায়নি তো কচি পাতা,
এ বড়ো যন্ত্রণার সালোকসংশ্লেষ।

গলা পচা লাশ ফুঁড়ে
হবে কি সবুজের অভিযান!
সূর্য এখানে দেখা যায় না,
ধুলোর ঝড়ে গাই প্রভাতসঙ্গীত।

পাথরের কাঠিন্য আজ আমার শরীরে,
হয়েছি পাষাণ, হয়েছি প্রস্তরীভূত,
সবুজ জীবনে পাথরের হদিশ ঠিকই মিলবে, দেখতে চাও?
তবে স্বাগত জানাই তোমায়
আমার প্রস্তর যুগে।

দূরত্ব

প্রিয়া দাস
চতুর্থ সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ

মা তোমার জন্য কোনোদিন লেখা হয়নি।
আমরা বড়ো হলে কেন যেন বদলে যাই,
এক একবার বদলে যাই।

মনে পড়ে, ছোটোবেলায় খেলতে খেলতে
হাত-পা কাটলেও ছুটে যেতাম তোমার কাছে।
তুমি ওষুধ লাগিয়ে দিতে খুব যত্ন করে।

খেলা এখনো শেষ হয়নি মা।
এই জীবনটা নিয়েও কেউ খেলে যায়।
তবু তোমার কাছে গিয়ে বলা হয়ে ওঠে না,
বড়ো হওয়ার সাথে দূরত্বটা যে সমানুপাতিক।
তাই আমি কাঁদি, তুমিও কাঁদো।
শুধু দূরত্ব শব্দটা ব্যবধান তৈরি করে দেয়।

ছোটো থেকে বড়ো হওয়ার সাথে জানি
তুমিও কাঁদো, আড়ালে এক কোণায়,
অন্ধকার হলেই কাঁদো,
বুঝতে পারি, শুধু ছুঁয়ে দেখা হয়না –
দূরত্বটা যে বড্ড বেশি হয়ে যায়।

ইচ্ছে-ডানা

চিরঞ্জিত কোলে
চতুর্থ সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ

ফেরারি মন আমার ছুটে চলে
দূর - দূরান্তরে।
বাধা নেই, মানা নেই,
পায়ে পায়ে পথ শেষে,
চলে যাই দূরে ...... আরো দূরে।

সেই পাহাড়ের কোণটায়
আমার নিশানা খুঁজে পাই,
সমুদ্রের ঐ ঢেউয়ের দোলায়
আমি ভেসে যেতে চাই।
আমি যেতে চাই
অশ্বারোহীর বেশে,
যাবো সেই রুপোর কাঠি সোনার কাঠি রূপকথার দেশে,
আমি যেতে চাই উটের পিঠে চেপে,
মরুর পানে, কোনো দেশে।

তারও পরে যেখানে হারিয়ে যেতে নেই মানা,
সেইখানে মেলে দেব আমার ইচ্ছে ডানা।

একলা বৃষ্টি

ঈশিতা গুছাইত
চতুর্থ সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ

ধোঁয়ার বালিশ হলদে আলো
মায়ের মতোই শান্ত সে
স্তব্ধতার এই গন্ডি চিরে
ক্লান্ত শব্দ নিঃশ্বাসের
হঠাৎ যাদের চোখ ভিজে যায়
বুকের ভিতর দারুণ ঝড়
বর্ষা নামে ব্যালকনিতে
বৃষ্টি তাদের একার ঘর
হঠাৎ করেই বৃষ্টি নামে
সব ভিজে যায় এক নিমেষে
পোস্টার ছুঁয়ে ঝুলে-থাকা
কাটা ঘুড়ির শেষ কবিতা
হয়তো কোথাও জানলা পাশে
দুজন মানুষ রাত্রি দেখে
কুয়াশা তাদের নাম জানে না
দূরত্বটাই বাড়তে থাকে।

ধর্মের বেশে মোহ যাকে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।

— *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

নেবুর পাতায় করমচা

অর্ক চট্টোপাধ্যায়
চতুর্থ সেমেস্টার, রসায়ন বিভাগ

রাতগুলো সব একলা নামে
বন্ধ চোখের বিষুবরেখায়।
একখানা চাঁদ জমিয়ে রেখো,
বৃষ্টিশেষের মেঘলা ছাতায়।

তর্কে আবার আজ হেরেছ,
চায়ের কাপে আয়লা-পিলিন
উঠিয়েছিল বিদ্রোহীরা —
রেনেসাঁসের পেনিসিলিন।

রাংতা ছিঁড়ে গেলার পরে
আততায়ীর যুক্তিখাতে
যুদ্ধজয়ের নিশান ওড়াও
শপথ গড়াক নর্দমাতে।

তবুও তুমি তর্ক করো
হার মানা কোন্ হারের লোভে!
অন্ধকারে পাথর কুড়াও,
হীরের প্রতি যে বিক্ষোভে।

আস্থা রাখো ঠুনকো প্রেমে
বিধর্মী কোন্ ইচ্ছেপুরুষ,
খাদের ধারেই জীবনযাপন,
মানের খোঁজে ফুরোচ্ছে হুঁশ।

বৃষ্টিবোঝাই মনের খেয়া
সামাল তরী, রূপনারায়ণ!
একফালি চাঁদ মেঘবিলাসী
ঠোঁট ছোঁয়াতে লজ্জা ভীষণ।

ঝরতে দিয়ো আদর করে
বৃষ্টি যত বে-মরশুমি
বর্ষাতি থাক বুকের ওমে
ইতি তোমার জন্মভূমি।

একলা অনুভূতি

প্রীতি ঘোষ
চতুর্থ সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ

অভিমানী হই না যতই
কেউ খোঁজে না অনুভূতি
মনটা পুড়ে ঝলসে যায়
মিথ্যা সবই প্রতিশ্রুতি।

আবেগন মেঘের কাছে
চেয়েছিলাম সোনালি আলো,
দিন-বদলের একলা রাতে
বৃষ্টিটুকুই দিয়ে গেল।

জীবন, সে তো গভীর চাওয়া
যার কুলকিনারা নাই
গভীর রাতে একলা ঘরেই
এখন, জীবন খুঁজে পাই।

থাক না কিছু নিঃসঙ্গতা
সময় কিছু নিজেরও থাক
নিবিড় প্রবাহের ছেঁড়া তারের
সুরগুলোও না হয় পূর্ণতা পাক।

স্বাধীনতার স্বাদ

দীপান্বিতা ধাড়া
চতুর্থ সেমেস্টার

হেঁটে চলেছি আমরা
যান্ত্রিকতার রক্তিম পথে
সবুজ মন শুভবুদ্ধিকে রুদ্ধ করে রেখে
খুঁজছি সঠিক পথের খোঁজ
প্রকান্ড ভয়ে হয়ে আছি জড়োসড়ো

জানি না কতদিন হাঁটব এই পথে
বুঝি না অন্তঃসারশূন্য নীতি
মন্ত্রোচ্চারণ বা ঈশ্বরের আরাধনা
কালরাত্রির অন্ধকার নামে
পিশাচের গান নিয়ে

যদিও
এ আঁধার ব্যর্থ হবে জানি
রামধনুর স্নিগ্ধ রংয়ে ভরবে আকাশ
স্বাধীনতার স্বাদ আসবে
জিহ্বায়, স্মৃতিতে...

সেই ভুতুড়ে জাহাজটা

সৌমিত্র কুন্ডু
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ

সকাল হতেই আমরা বেড়িয়ে পড়েছিলাম সাগরে
তিমির চামড়ায় তৈরি নৌকা চড়ে,
রওনা হয়েছিলাম ভুতুড়ে জাহাজের সন্ধানে
অনেকের মুখে নানা গল্প শুনে।

ভুতুড়ে জাহাজটা দেখেই আমার সঙ্গীদের
অনাহারক্লিষ্ট মুখ ঝলমলিয়ে উঠেছিল,
ভেবেছিল, ওদের ভাগ্য দারুণ ভাল।
ওরা উত্তেজিত উচ্চরবে কথা বলছিল,
অবশেষে জাহাজটার খোঁজ মিলল।

শ্যাওলা ধরা জাহাজে উঠেই ওরা ছড়িয়ে পড়েছিল সবখানে
লুকানো গুপ্তধনের সন্ধানে,
আমি কেবল ডেকে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম
অতীতের ধূলা-জমা জীর্ণ জাহাজটার সব জায়গাতে
অসংখ্য মানুষের চিহ্ন ছড়ানো।

শুনেছিলাম ওদের উত্তেজিত মারামারির শব্দ,
হয়তো ওরা ভেবেছিল, সব সম্পদ নিজে কেড়ে নিলে
হওয়া যাবে অমর, সর্বশক্তিমান!
তারপর আমরা সবাই হারিয়ে গেলাম,
হালকা হয়ে নীল তারার সমুদ্রে মিলিয়ে গেলাম
যেমন আর সবাই যায়, নইলে আর জাহাজটা ভুতুড়ে কেন?

দেখলাম, অসীম আকাশের তলায়
সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ সমুদ্রে ঝরে পড়া,
দেখলাম নিজের অতীত, ঝটিকা সাগরের বুকে
আকাশে ক্ষনস্থায়ী নীলিম অরোরা।

মোহের মোহনা

অনির্বাণ দলুই
চতুর্থ সেমেস্টার, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

গ্রীষ্মের স্বর্ণযুগ

তার বয়স তখন আট
গ্রীষ্মের লম্বা বিকেলে
মনপ্রাণ উজাড় করা খেলা,
কত শত বন্ধু, নিঃস্বার্থ বন্ধু।
বিকেলের সোনালি আভায় জীবনের স্বর্ণযুগ
এই তো ছিল তার জীবন!

স্কুলে নতুন বই পাওয়ার আনন্দ,
টিফিনে গেটের বাইরের সেই আচার,
ছুটির পর ঝিলের ধারে ব্যাঙাচি
করার কত চেষ্টা।
যে কালবৈশাখীর প্রকোপে
বুদ্ধিমানেরা ঘরে থাকত,
সেই ঝড়েই সে যেত পাশের
বাগানে আম কুড়াতে,
যখন ঝড়-বৃষ্টিতে সবাই নাজেহাল
সে তখন ব্যস্ত কাগজের নৌকা ভাসাতে।

কই সেই ঝড় তো তাকে বলেনি,
এই সব সে হারাবে একদিন।
তখন মাঠের প্রতিটি ধুলিকণায়
ছলকাত জীবনের অজানা অর্থ,
কই সেই মাঠ তো তাকে বলেনি
সেই অর্থ সে ভুলে যাবে একদিন।
কই সেই ঝিলও তো তাকে বলেনি
এই জীবনের অলিখিত নিয়তি।

হয়তো তখনও সময় হয়নি তাই।

রঙিন বর্ষা

চারপাশে ঘন আঁধার নেমেছে।
মেঘের গর্জন আর বিদ্যুতের বিকৃত ঝলক,
এই রহস্যময়ী প্রকৃতিকে আরো অদ্ভুত করে তুলেছে।
আর এই অঝোরে বৃষ্টি হয়তো সংকেত।
হয়তো তার আঠেরোটি বসন্তের
একাকিত্বের অবসান এই বর্ষায়।
তার জীবনের এত রুক্ষতায় যেন
এই বর্ষায় প্রাণসঞ্চার হয়েছে।

কলেজ পালিয়ে কত সিনেমা,
অপ্রকাশিত কত শত কবিতা,
চোখ ভর্তি স্বপ্ন,
বাস্তবতার কাঠিন্য অস্বীকার করা রঙিন যৌবন,
এই বর্ষায় আরও পরিস্ফুটিত হয়েছে।
জীবনের উদ্দেশ্য এই বর্ষায়
যেন উজ্জ্বল তারার মত পরিষ্কার।
তার কাছে যেন সবকিছুই নিশ্চিত,
সবই যেন তার হাতের মুঠোয়,
যেন বিশ্বজয়ের শক্তি আছে তার সেই মুঠোয়।
তবে এই বর্ষাও যে তাকে বলেনি সেই
অলিখিত নিয়তি।
তবে কি এখনো সময় হয়নি!

শরতের আভাস

শিউলি ফুলের গন্ধমাখা ছত্রিশতম শরতের সকাল
মেঘ সরে যাচ্ছে, সবকিছুই
ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে।
তার বহুকালের ইচ্ছে হঠাৎই সুযোগ হয়ে এসেছে,
পর্বতারোহণের সুযোগ!
রওনা শিগগির!
দেখতে দেখতে কালচক্র এনেছে
তাকে পর্বতের সম্মুখে।
প্রাচীন, অভিজ্ঞ এই পর্বত যেন
তাকে এক আভাস দিচ্ছে।

যেন বলছে,
''কার খোঁজে এসেছো, আমার নাকি নিজের!
যাত্রাকালীন তার মনে হাজারো প্রশ্ন,
যখন সে চূড়ায় পৌঁছাল,
সে নীচে দেখল, তার সমস্যা, সন্দেহ,
দুঃখ, প্রশ্ন সব কত ছোটো!

ফেরার পথে তার মনে পড়ল,
সে যে খুব ব্যস্ত!
তাকে যে সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ গড়তে হবে!

কোন ভবিষ্যৎ কে জানে!
সময় সুযোগ দেয়, নির্বাচন করে না!

ব্যস্ততার হেমন্ত

বহু ব্যস্ততায় তার কেটে গেল
আরো বিশটি মনোরম হেমন্ত,
সুরক্ষিত অবসরের উদ্দেশ্যে।

মায়ামুক্ত শীত

জ্যোতিষ্কখচিত এক কনকনে রাতে,
Fireplace-এর উষ্ণতায় মগ্ন,
সদ্য অবসরপ্রাপ্ত লোকটি
বইয়ের শুকনো পাতায় জীবনের রঙ
খোঁজার চেষ্টা করছে।

যত দিন এগিয়ে চলে,
ধীরে ধীরে তার শরীর ভেঙে পড়ে,
তার মন উত্তাল সমুদ্রের মত অশান্ত হয়,
আকাশের প্রাচীন তারাগুলি, যারা
যুগ যুগ ধরে দেখছে কত জন্ম মৃত্যু,
তাদের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে
অবশেষে আজ সে জীবনের সেই
মহান প্রশ্নের সম্মুখীন।

শীতের মনোরম অবসর তার কাছে,
জীবনের সবচেয়ে বড়ো অপরাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তার সমস্ত জীবন সে শুধু
সুরক্ষিত অবসর চেয়েছে,
তবে তার সারা জীবন সে নষ্ট করেছে।
এত বছর পর সে বুঝেছে,
মুহূর্তের জীবনে, জীবনের মুহূর্তগুলি নির্ভীকভাবে
বাঁচাই তো জীবন!
আর সেই মুহূর্তগুলির স্মৃতি সঞ্চয়ই তো
জীবনের আসল মানে!

হয়তো সময় এসেছে তবে,
যে অনেক দেরি হয়ে গেছে!

বসন্তের অতিথি

এক রহস্যময়ী হাওয়া, এক অজানা শক্তি
ঝরিয়ে ফেলছে সমস্ত পুরানো শুকনো পাতা।
বসন্ত এসে গেছে!
সঙ্গে এনেছে এক অপ্রত্যাশিত অতিথি!

তার সমস্ত মোহের মোহনা অনিবার্য!
এটাই কালের নিয়ম! অলিখিত নিয়তি!
আবারও পুনরাবৃত্তি হবে
কালের অমোচনীয় ঋতুচক্র!
তবে কেন!

যে নদীর উৎসের সাথেই তার মোহনা নির্বাচিত,
তার উৎসের কারণ কী ?
যার সৃষ্টি আছে তার ধ্বংস অনিবার্য!
কিন্তু ধ্বংসই যদি নিয়তি হয়
তবে সৃষ্টির কারণ কী!
বিনাশই যদি অবশ্যম্ভাবী
তবে ব্রহ্মাণ্ডে অস্তিত্বের কারণ কী!
এর উত্তর খোঁজই কি জীবনের আসল মানে!
প্রশ্নটা তো রয়েই গেল!!!

ইচ্ছেগুলো

সায়ক ভট্টাচার্য
চতুর্থ সেমেস্টার, অর্থনীতি বিভাগ

কুড়ি বছর অতিক্রম করে একুশ এর দিকে খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছি। এত কাল একা থাকার ফলে অনেক অদ্ভুত জ্ঞান সঞ্চয় করে ফেলেছি। জন্মেছিলাম এক মধ্যবিত্ত পরিবারে যেখানে 'হ্যাঁ' এর থেকে 'না' শব্দটা অনেক বেশি ব্যবহৃত হয়। জানেন খুব ছোটোবেলায় শিখে নিতে হয়েছিল 'ইচ্ছে' নামক কোনো শব্দের স্থান আমার জীবনে থাকবে না কারণ তার জন্য টাকা থাকা চাই। তাই আমার পরিবার সযত্নে ওটিকে গলা টিপে হত্যা করেছে। খুব ছোটোবেলায় মাকে হারালাম। না না, মা মারা যাননি কিন্তু নিজের স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলেন। তাই অভিযোগ করার ইচ্ছেটাও চলে যায়। মা পরিণত হন সাংসারিক দাসীতে, যেখানে আলু-পেঁয়াজ-আদা-রসুন-হলুদ-তেল-এর হিসাবের চক্করে সব জলাঞ্জলি। সুন্দরী মা আজও অপরূপা তাই তো বয়স বাড়ার পর তার কষ্টটা আমায় বড়ো বেদনা দেয়। পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলোয় যখন সবাই সোনার অলংকারে সেজে উঠতেন আমার মা তখন একটা সরু চেন পরে সবার সামনে আসতেন আর আড়ালে অঝোরে কাঁদতেন। ছোটোবেলায় যখন দেখতাম আমারই সমবয়সীরা মা-বাবার হাত ধরে হাঁটছে আমি তখন পারিবারিক কোন্দল মেটাবার জন্য দুইজনের মাঝে দাঁড়িয়ে। রাসের মেলায় খেলনা কোনো দিন আমার কেনা হয়নি, সাহসই হয়নি কোনোদিন মুখ ফুটে বলব। গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হওয়ার পর যখন স্কুল যেতে হত তখন আমার যেন জ্বর আসত, গেলেই তো বন্ধুদের মুখে শুনতে হবে দার্জিলিং, সিমলা, কাশ্মীর, কুলু-মানালি বা ডুয়ার্সের গল্প। আর আমার পালা এলে বানিয়ে বলতে লজ্জা পেতাম। তবে ছোটো থেকে মুখে হাসি রাখতে শিখে গেছিলাম। যত বড়ো হয়েছি অভিমানের পারদ পাল্লা দিয়ে বেড়েছে কিন্তু কাকে শোনাব সে-সব, তথাকথিত একলাদের মধ্যে আমার বিচরণ। আমি আজও কোনো জন্মদিনের বাড়ি যেতে ভয় পাই কারণ কোনোদিন নিজের জন্মদিন যে উদ্‌যাপন করা হতে পারে এরকম ভাবনাও আসেনি। কোনো বন্ধুর জন্মদিনে যেতামও না, মনে আঘাত লাগত, বলে ফেলেছিলাম জানেন বাবাকে আমার জন্মদিন, বাবা বলেছিল ''গরীবের ঘোড়া বাই'' আর কিছু কোনোদিন বলতে পারিনি। আজও ওই শখটা অপূর্ণ।

পুজো, এটাও আমার কাছে কষ্টের। বাবা-মার সাথে পুজোর শপিং শুধু শুনেছি উপলব্ধি করিনি কারণ তার জন্য যা চাই নেই সেটা। তাই শপিং মলে ট্রায়াল রুমের আয়নায় সেলফি তুলতে কেমন লাগে জানি না। রবিবারে যখন এপাশ ওপাশ থেকে মাংসের গন্ধ আসত তখন মনটা আনচান করত কিন্তু ছোটো থেকে একটা কথা কানে গুঁজে দেওয়া হয়েছে নিজে রোজগার করলে বিলাসিতা করবে। তারপর একদিন বাবার চাকরি গেল চলে, খাতার পাতা শেষ হলেও বলতে পারতাম না, বন্ধুবান্ধবদের থেকে নিয়ে রাখতাম তারা বুঝতে পারত না কিন্তু দিয়ে দিত। আর্সালান, হাফিজ, আউধ, মোঘল ওগুলো নামেই শুনেছি আস্বাদন আর হয়নি। দিনের শেষে যখন ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে টেনে বাড়িতে ফিরি তখনও মনের কথা বলার বা শোনার জন্য কেউ এগিয়ে আসে না। তবে এসব অভ্যাস হয়ে গেছে জানেন। কাউকে পাশে পাই না বলে খুব কথা বলতে ভালোবাসি, সবাই বলে 'বাচাল', বন্ধুরা বলে 'চুপ কর না', কারণটা জানে না আবার কাউকে বলতেও সাহস পাই না। তাও ওদের কাছেই ছুটে যাই, সামনে ভালোবাসা পাই কিন্তু পিছনে আমায় নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা যে হয় তা ভালোই বুঝতে পারি। গভীর রাত্রে স্বপ্নেও নারী আসে না, আসে কি করে মাকে একটা নতুন শাড়ি কিনে দেব, কি করে বাবার জন্য নতুন জুতো কিনব, জানি না।

মাঝে মাঝে খুব জোরে চিৎকার করতে ইচ্ছা করে। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে অঝোরে কাঁদতে বা প্রাণ খুলে হাসতে বা কাউকে জড়িয়ে ধরতে......দিনের শেষে সবারই একটা কমফোর্ট জোন দরকার যে। আমাদের জীবনেও প্রেম ভালোবাসা আসে তবে তা হয় ক্ষণিকের, কারণ আমাদের তো কিছু দেওয়ার থাকে না। জানেন আমরাও চ্যাট বক্সে পাগলের মতো কথা বলতে পারি, আমরাও নিজেদের উজাড় করে দিতে পারি কিন্তু সবই সেই স্বপ্নে দেখা রাজকন্যার মতো। সারাদিনের পর আমরাও চাই কারুর আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে, চাই কেউ জড়িয়ে ধরে রাখুক, চাই কেউ অন্তত জিজ্ঞাসা করুক দিনটা কেমন কাটল। কিন্তু সেসব কিছু হয় না। না পেয়ে পেয়ে এমন অবস্থা যে কিছু ভালো ঘটলেও সন্দেহ হয় যে এর পিছনে অন্য কোনো কারণ নেই তো। সাফল্য আমরাও পাই কিন্তু সেটা ভাগ করে নেওয়ার মানুষ পাই না। এত নেই নেই বলছি ভাবছেন তো যে সত্যি কি কিছুই নেই? আছে, আছে ওই যে বেঁচে থাকার তাগিদ। আমাদেরও এমন বন্ধুবান্ধব থাকে যারা খুব আশ্বাস দিতে পারে একদিন হবেই, তারাও জানে সেই দিন কখনোই আসবে না, তাও বুকে সাহস নিয়ে বলে দেয় আর আমরাও হাড়-হাভাতের মতো বসে থাকি তার অপেক্ষায়। জীবনের একদিকে যেমন শুধু আলো আর এক দিকে অন্ধকার তাই আলো গেলে অন্ধকার আবার অন্ধকার গেলে আলো। এই চক্রটা আমাদের কাছে যেন ওই কালোতে গিয়ে সীমাবদ্ধ। না থাকে ছোটোবেলা না আসে যৌবন, আর বার্ধক্য.... জানি না। তবে আমারও একদিন হবে, এই মধ্যবিত্ত চিন্তাভাবনায় আমরা দিন কাটিয়ে নিচ্ছি আর মাঝে মাঝে অমিতাভ বচ্চনের সংলাপ ছুঁড়ে দিচ্ছি ''বাবু মশাই জিন্দেগি বড়ি নেহি

লিম্বি হোনি চাইয়ে”— কি ঠিক বললাম তো? কিন্তু আমাদের মতো নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষগুলোর কাছে এগুলো সেই ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার মতো। আমার ইচ্ছা করে মা-বাবাকে নিয়ে যাই কোনো বড়ো শপিং মলে, গিয়ে প্রচুর শপিং করি, বাবার সাথে মায়ের ছবি তুলে দিই #life line বা #fam time কিন্তু ওগুলো থাক...দিন দিন আরো সব দূরে চলে যাচ্ছে যেন, কাছের মানুষগুলোই আর আসে না, তাদের কাছে যেতেও ভয় পাই কারণ কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হয় যে। দূর থেকে হাসি, কাছে যাই না আর ‘ইচ্ছা’......ভাগ্যদেবীর অসীম কল্যাণে ‘ইচ্ছেগুলো’ শব্দই রয়ে গেছে।

যাক অনেক বকলাম, আসলে একা মানুষ তো বুঝতেই পারছেন কাজকর্ম নেই তবে আমার কিন্তু অন্যের সুখ সহ্য হয়। নেই নেই করে আক্ষেপ করছি তাই গালাগালি দিচ্ছেন তো ? একদিন আমার জীবনটা বেঁচে দেখুন গালাগালি বেরোবে না কথা দিলাম।

> আমি দেশমায়ের দাস নহি। নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব — লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।
>
> — *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর*

দলছুট

শর্মিষ্ঠা রীত
স্নাতকোত্তর (দ্বিতীয় বর্ষ), ইংরেজি বিভাগ

প্রতি বিকেলে রোদ এসে পড়ে বেঞ্চিগুলোতে আমাদের উপস্থিতি-অনুপস্থিতির তোয়াক্কা না করেই। শালিক পাখিরা কিচিরমিচির করে একইরকম। ঝাঁপ দেয় এ বেঞ্চ থেকে ও বেঞ্চে। রোজই একই সঙ্গীর সাথে আসে কি ? আমরা বেঞ্চ পাল্টেছি, প্রয়োজনে বন্ধুও। তবু রোদ আসে, পাখিরাও গান করে। শীতের কালে মনে আছে কয়েকটা পায়রা এসে ঠায় বসে থাকত জানলাতে, শীতের সীমিত বেলায় সূর্য ডোবার সময়টা মুহূর্তে কেটে গিয়ে আকাশের গোলাপি আভা মিশে যেত ক্লাসের গোলাপি দেওয়ালের সাথে। রোদটা যে কখন বেঞ্চ পেরিয়ে পেরিয়ে মেঝেতে পড়ে আবার বিলীন হয়ে যেত সেটার খেয়াল রাখা হয়নি। পাখিদের আনাগোনা ছাড়া জানালার বাইরেটা বর্ষাকাল ব্যতীত বড়ো ধুলোপড়া, একপ্রকার অচল, বড়োজোর দূরের কোনো ছাদের জামাকাপড় হাওয়া দিলে উড়তে থাকে, ক্লিপের আলগা বাঁধন না মেনে, ছিটকে ছিটকে জল পড়ে আচারের কৌটোর গায়ে।

ক্লাসের তত্ত্বকথার বহর বাড়তে থাকে, পাখিরা ডানার ভিতর কিছুক্ষণ মুখ গুঁজে বসে, ভিজে মাথা দুবার ঝাঁকিয়ে উড়ে চলে যায় পাশের বিল্ডিং-এর কার্নিশে। ক্যানারির কথা মনে পড়ে, স্নানের সময় ছটফটে ক্যানারি। হাওয়া আসে যায়, বব ডিলানের গানের লাইন লেখা কাগজটার ওপরের প্লাস্টিক কভারটা ফুলে ফুলে ওঠে –

''Yes, 'n' how many times must the
cannon balls fly
Before they're forever banned...''

একঝাঁক পায়রা কলেজ বিল্ডিং-এর একপাশ প্রদক্ষিণ করতে থাকে, তাদেরই এক একজন দলছুট হয়ে টিনের ছাউনিতে বসে পড়ে। অদূরেই লম্বা টাওয়ার তৈরির কাজ চলতে থাকে, অনবরত কুয়ো থেকে জল তোলার মতো করে ওপরে উঠে যায় লম্বা বাক্সের মতো দেখতে লিফট। গুটি গুটি পিঁপড়ের মতো কটা লোক ওতো উঁচুতে কী যেন বানিয়ে চলেছে। ওখান থেকে হয়তো আমাদের ক্লাসরুমের জানলাটাও একটা বিবর্ণ বাক্সের ঢাকনার মতো লাগে। ক্লাসের ভিতর সবুজ বোর্ডের ওপর খসখস করে লেখা হয় 'অ্যাবসার্ড থিয়েটার'। দলছুট পাখিরা আবার দলে মিশে তরঙ্গের ন্যায় উড়ে যায়। বৃষ্টি এলে চারপাশটা ধোঁয়া হয়ে যায়। বেলিলিয়াস পার্কের শ্যাওলা ধরা ওয়াটার পার্কের জল স্থিরতা ভেঙে বুজগুড়ি দিয়ে ওঠে। বৃষ্টির দিনগুলোতে দলছুট পাখিরাও দলবদ্ধ হয়ে টিনের ছাউনির নীচে জবুথবু হয়ে বসে পড়ে। ছাতারে পাখিরা ভিজে এসে, ঠান্ডায় কেঁপে কেঁপে জল ঝেড়ে ঝেড়ে, তুলোর চোখ ঢাকা পুতুলের মতো গুটিসুটি হয়ে বসে পড়ে। বৃষ্টি থেমে গিয়ে দুপুরের পর হঠাৎ ভীষণ রোদ ওঠে। রোদ উঠলে ছাতারেও উড়ে যায়, পায়রাগুলোও। আমরা ভাগ হয়ে ভাগাভাগি করে টিফিন খাই। ডানদিকের জানলা দিয়ে রোদ্দুর এসে পড়ে বোর্ডে, ''অ্যাবসার্ড'' লেখাটা অর্ধেক অস্পষ্ট হয়ে যায়। রোজই বেলাশেষের ক্লাসে সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ঝিমিয়ে পড়ি। বেঞ্চের কোনে রোদ পড়ে তার ওপরের আঁকচারা গুলোকে গভীরতা দেয়, তবে স্পষ্টতা হয়তো কখনোই নয়। আমরা পড়তে থাকি –

''ড্রিপ ড্রপ ড্রিপ...'' সূর্যটা ক্রমশ লালচে হতে থাকে। বেঞ্চের রোদ হারিয়ে যায়। সূর্যটা সবার অগোচরে লুকিয়ে পড়ে। পায়রাটা আবছা অন্ধকারে কী ভেসে আসে, শার্সিতে কালো অবয়বের ন্যায় বসে থাকে। জানলার বাইরেটা অন্ধকারে ডুবে যায়। দূরে টিমটিমে আলো জ্বলে ওঠে। আমাদের ক্লাসের আলোগুলো এক এক করে বন্ধ হতে থাকে। ছুটির পর জনহীন করিডোরটা আরও দীর্ঘায়িত বোধহয়। ক্যাঁচ করে দরজা বন্ধের শব্দ হয়, বেঞ্চ-ক্লাস-বোর্ড একসাথে গুম হয়ে যায়। রাতের খবর কেউ রাখিনি। সিঁড়িতে শেষের কয়েকজনের নামার শব্দ হয়। নামতে নামতে আমরা নিজেরা নিজজনের সঙ্গে সময় ভাগ করে নিই। সময় আমাদের বিভাজিত করে দেয়।

গুরু কৃপায় গুরুদংমার

সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যক্ষা, নরসিংহ দত্ত কলেজ

অখন্ডমন্ডলাকারং বয়াপ্তং য়েন চরাচরম।
তত্পদং দর্শিতং য়েন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ

গুরুস্তোত্র দিয়ে লেখাটা শুরু করলাম কারণ এই ভ্রমণ বিবরণের সঙ্গে ''গুরু'' শব্দটি এবং ''গুরু'' বিষয়টি বিশেষ ভাবে জড়িয়ে আছে। এবারের ভ্রমণ গন্তব্য গুরুদংমার। ভ্রমণ পত্রিকা, ইন্টারনেট এবং আরো অজস্র রকম তথ্যের কল্যাণে গুরুদংমার বেশ পরিচিত একটি গন্তব্য। তাই এখানে যাওয়ার রাস্তা বা অন্যান্য কেজো বিবরণে আমি বিশেষ আগ্রহী নই। আমার উদ্দেশ এই জায়গাটির সাথে জড়িয়ে থাকা আমার কিছু অনুভূতি আমার কয়েকজন ভ্রমণ অনুরাগ বন্ধুর সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া।

গুরুদংমার হ্রদ বিশ্বের উচ্চতম হ্রদ গুলির তালিকাভুক্ত ভারতের দ্বিতীয় উচ্চতম হ্রদ, যার উচ্চতা ১৭৮০০ ফুট (৫৪৩০ মিটার)। এই হ্রদের নাম থেকে শুরু করে, সুস্থভাবে এই হ্রদ দেখে আসা সবটাই যে গুরুকৃপা নির্ভর তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। এই হ্রদের সঙ্গে ভারতীয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতার একটা ইতিহাস জড়িয়ে আছে। বৌদ্ধ ভক্তরা মনে করেন তাদের গুরু পদ্মসম্ভব এই হ্রদ কে পুণ্যতীর্থে পরিণত করেন। শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ মনে করে তাদের গুরু নানক এই হ্রদকে পূণ্যতীর্থে পরিণত করেন। মজার কথা হল যে সম্প্রদায়ের পরম গুরু ই কাজটা করে থাকুন না কে উদ্দেশ্য ছিল খুবই মহৎ এবং তা একেবারেই সাধারণ মানুষের অস্তিত্বরক্ষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইতিহাস বলে এই হ্রদ বছরের বেশীরভাগ সময়েই জমে বরফ হয়ে থাকে ফলে নিকটবর্তী গ্রামবাসীরা পানীয় জলের জন্য খুব কষ্ট পেতেন। এই অবস্থায় তারা তাদের গুরুর দ্বারস্থ হন। কথিত আছে গুরুস্পর্শে গুরুদংমার হ্রদের বরফ গলে স্বাদু জল পাওয়া যায় যা গ্রামবাসীদের প্রাণরক্ষা করে। কী অপূর্ব ইতিহাস। গুরু কোন সম্প্রদায়ের সে তর্ক না হয় থাক। কিন্তু ভারতের সনাতন ধর্মের গুরু পরম্পরার কী অসাধারণ বুনিয়াদ! পৃথিবীর যেকোন দেশের কাছে উদাহরণ স্বরূপ। গুরুকৃপাধন্য বলেই এই হ্রদের জল অত্যন্ত পবিত্র এবং এই হ্রদ কে পুণ্যতীর্থ হিসাবে যারা দর্শন করতে আসেন তারা এই হ্রদের জল সঙ্গে নিয়ে যান পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে। এতো গেল গুরুকৃপার ইতিহাস। এবার আসি অন্য কথায়। আমি আগেই বলছিলাম সুস্থভাবে এই হ্রদ দর্শন করে ফিরে যেতেও গুরুকৃপা লাগে সেটা কিন্তু নিছক মজার কথা নয়।

২০১৫র এপ্রিল মাসে প্রথম গুরুদংমার যাওয়ার পরিকল্পনা করি। আমার পরিচিত কয়েকজনের দল রওনা দিয়েছিলাম। খুব ভাল মনে নেই তবে এটুকু মনে পড়ে সেদিন আবহাওয়া খুব ভালো ছিল না। আকাশের মুখে হাসি ছিল না, মেঘের দল লুঠ করে নিয়েছিল সে হাসি। ভোররাতে বেরিয়ে দীর্ঘ পথ পার হয়ে পৌঁছেছিলাম গুরুদংমারের দোরগোড়ায়। নিকটবর্তী শহর লাচেন থেকে গুরুদংমার হ্রদের দূরত্ব প্রায় ৬৭ কিমি যার সিংহভাগ অতিক্রম করে ফেলেছিলাম আমরা। সেবার আমাদের দলটা ছিল অন্যরকম। দলের সব সদস্যরাই ছিলেন হিমালয়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতায় বিদগ্ধ। পায়ে হেঁটে পাহাড় চষে ফেলার হাজারো গল্প তাদের ঝুলিতে বন্দি। কিন্তু ক্যালেন্ডারের নিরিখে তারা প্রবীণ। প্রতি মুহূর্তে পাহাড়ের বৈচিত্রের রস নিংড়ে নেওয়ার মত নবীন তাদের মন। আমি এই বর্ষীয়ান সেনানীর কনিষ্ঠতমা। প্রবল উৎসাহে গাড়ী ছুটিয়ে আমরা পৌঁছেছিলাম গুরুদংমার এর রাস্তায় ভারতীয় সেনার শেষ চেকপোস্টে। মাথায় পাগড়ি, চাপদাড়ি এক শিখ সেনা অফিসার আমাদের গাড়ির দিকে এগিয়ে এলেন। কড়া হেডমাস্টারমশাই সমস্ত তথ্য নিয়ে জানালেন আমাদের গাড়ি যাবার অনুমতি তিনি দিতে পারবেন না। কারণ ষাটোর্দ্ধ মানুষের এ পথে যাওয়ার অনুমতি মেলে না। সর্বনাশ! এ তথ্য তো আমাদের জানা ছিল না! দলে আমরা দুজন ছিলাম যাদের বয়স ষাটে-র অনেক কম। আমাদের চোখমুখ দেখে বর্ষীয়ান সদস্যরা সেনা অফিসারকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন, ওদের অন্তত যেতে দিন। বাকিরা সেনাছাউনিতে অপেক্ষা করবে, ওরা ফেরার পথে তাদের নিয়ে যাবে। ছোটোদের জন্য বড়োদের আত্মত্যাগের এই পরম্পরা শুধু এ দেশেই মেলে। কিছুতেই রাজী হলেন না। অনেক অনুনয় বিনয় করেও মন গলানো গেল না বজ্রকঠিন সেনা অফিসারের। উনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন সরকারি নিয়মের কোন নড়চড় তিনি করবেন না কারণ এখানে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় যে কোন রকম বিপদ ঘটে যেতে পারে। অগত্যা! চেকপোস্টের ওপারের রাস্তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলাম। মনে হল হিমালয়ের এই প্রত্যন্ত তীর্থক্ষেত্র প্রত্যাখ্যান করল আমায়! ভারাক্রান্ত মন নিয়ে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে ফিরতি পথ ধরতে হল। পাহাড়ি পথে গাড়ির একদম পিছনের সবচেয়ে অস্বাচ্ছন্দ্যের আসনটা আমার খুব পছন্দের কারণ ওখানে বসলে অনেকটা সময় পর্যন্ত পেরিয়ে আসা পথটা দেখতে পাওয়া যায়। যতদূর দেখা যায় দেখছিলাম চেকপোস্টের ওপারের রাস্তাটা। মনে মনে ভাবছিলাম বড় বড় অভিযানে অভিযাত্রীরা যখন অসফল হয়ে ফেরেন কী দুর্বিষহ হয় তাদের মনের অবস্থা। মনকে বুঝিয়েছিলাম আবার নিশ্চয়ই সুযোগ আসবে। জীবনের অনেকগুলো দিন তো পড়ে আছে।

পরমেশ্বরের কৃপায় সে সুযোগ মিলল ২০১৯ এ। পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা কয়েকদিনের ছুটি পাওয়া গেল এমন এক সময়ে যেটা

সিকিম যাওয়ার জন্য আদর্শ। রোডোডেনড্রনের ফুল ফোটার সময় এটা। তাই সুযোগটা হাতছাড়া করলাম না। বেরিয়ে পড়লাম গুরু স্মরণ করে। দেখা যাক এবার সফল হই কিনা। সিকিম এর কয়েকটা গতানুগতিক জায়গা দেখে এলাম লাচেন। পরের দিনের গন্তব্য গুরুদংমার। লাচেন থেকে যখন বেরোলাম, আকাশে সবে হালকা রঙ ধরেছে। আগের রাতে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। মনটা অনিশ্চয়তার দোলাচলে অস্থির। কী জানি গুরুদংমার দেখার গুরুকৃপা থেকে এবারেও বঞ্চিত হব না তো! লাচেন থেকে গাড়ি যত এগোচ্ছে তত মনে আশা জাগছে এবার বোধহয় কপাল খুলবে। ক্রমশ আলোয় ঝলমল করছে চারিদিক। পাহাড়ের প্রত্যেক বাঁকে শুরু হয়ে গেছে রোদ-ছায়ার গোপন বৈঠক। কানে কানে কী যে বলে তা শোনার সাধ্য কারো নেই। রাস্তার দুই ধারে সাজানো রয়েছে বিস্ময়। ৯০০০ ফুট থেকে যাত্রা শুরু করেছি। পাহাড়ে এক উচ্চতা থেকে যাত্রা শুরু করে কোন এক উচ্চতায় পৌঁছনোর মধ্যে একটা রোমাঞ্চ আছে। বনাঞ্চলের ঘনত্ব কমে যাওয়া, সুদীর্ঘ চিরহরিৎ গাছগুলোর উচ্চতা কমে যাওয়া। সর্বোপরি টুক টুক করে উঁকি মারতে থাকা তুষারশৃঙ্গের দেখা মেলা। খানিকটা যাওয়ার পর একটুক্ষণের জন্য দাঁড়ালাম। বিহ্বল হয়ে দেখলাম চারিদিকের দৃশ্য। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, আমার চোখের সমান্তরালে লাচেন নদীর বিস্তীর্ণ উপত্যকা। চোখ নামালে পাহাড়ের ঢাল লাল করে ফুটে আছে রোডোডেনড্রন, চোখটা ওঠালে বরফের টুপি পরে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি পাহাড়। এ দৃশ্যের কোন বিকল্প হয় না। এ দৃশ্য বন্দী করা যায় না ক্যামেরায়, এ দৃশ্যের বিবরণ লেখা যায় না, শুধু উপভোগ করা যায়। হে মহামহিম, সমগ্র ধরণী তোমার লীলাক্ষেত্র। এই দুর্গম পাহাড়ে নিরন্তর প্রবহমান তোমার সৃষ্টি, তোমার দৃষ্টি। নির্বিকল্প তোমার প্রকাশ। মাথা নত হয়ে গেল। হে দেবাদিদেব আমি ধন্য। তোমার চরণে শতকোটি প্রণাম।

'চিদাকাশমাকাশবাসম ভজেহম'

আবার যাত্রা শুরু। বাঁদিকে সর্বক্ষণের সাথী লাচেন নদী। তিস্তা নদীর অন্যতম বাহু। ভুটানের দংবা রেঞ্জের কোন অঞ্চল থেকে উৎপত্তি এই লাচেনের। উত্তর সিকিমের চুংথাং অঞ্চলে লাচুং নদীর সাথে মিশে সৃষ্টি করেছে তিস্তা নদী। সিকিমের বিস্তীর্ণ জনপদগুলির প্রধান নদী এই লাচেন। অসম্ভব উচ্ছল। নদীর জীবনবৃত্তান্তের উচ্ছলতম সময় হল এই অংশটুকু যা উৎস থেকে এবং মোহনা থেকে বেশ দূরে। ঠিক যেন মানুষের যৌবনের সময়টুকুর মত। এই রাস্তায় লাচেন নদীর গতি বড়ো বিচিত্র। কখনো বড়ো বড়ো বোল্ডারের আড়ালে নদীর গতি দেখাই যায় না, রাস্তার পরের বাঁকেই নদীটি একদম যেন রাস্তার উপর দিয়েই বয়ে চলেছে। এইরকমই একটা বাঁকের পরে দেখলাম লাচেন চলেছে রাস্তার সমান্তরাল। বেশ দীর্ঘ অনেকটা পথ। যেন গাড়ির চাকার সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে চলেছে। নদীর পরিসর খুব বড় নয়। চোখ তুলে তাকালেই নদীর ওপাড়। ওপাড়টা ছেয়ে আছে ছোট্টো ছোট্টো হলুদ ফুলের গাছে। দূর থেকে ঠিক ঠাহর করা যায় না। হঠাৎ একটা জায়গায় দেখলাম এপাড়েও আছে। আরে এ তো রোডোডেনড্রন। ঘন সবুজ পাতার ফাঁকে হলুদ ফুলগুলো যেন তারুণ্যের প্রকাশ। গাছগুলো বেঁটে বেঁটে। সারি সারি গাছে হলুদ ফুলগুলো লাচেনের সৌন্দর্য হাজার গুণ বাড়িয়ে দেয়। সেই হলুদপরীদের পিছনে ফেলে আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে পাহাড়ি পথ ধরে। দূরে ছোট্টো খেলনা ঘরের মতো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেনাছাউনি। দেখেই বুকটা দুরুদুরু কেঁপে উঠল যেন। হে মহাদেব কৃপা কর। এবার যেন আর ফিরতে না হয়। মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপ করছি। হে করুণাসিন্ধু, বিমুখ কোর না। দেখতে দেখতে এসে গেল চেকপোস্ট। চেকপোস্টের চেহারায় অনেক বদল হয়েছে। রাশটাও যেন অনেক আলগা। প্রথমেই খুঁজছিলাম সেই চাপদাড়ি শিখ অফিসারকে। না তিনি নেই। থাকার কথাও নয়। এবার আর অনুমতি পেতে কোনো অসুবিধে হল না। শুধু নিয়মমাফিক পরিচয়-পত্রটুকু দেখাতে যা দেরী, গড়গড় করে এগিয়ে গেলাম আমরা। চেকপোস্টের লোহার বারটা উঠে যেতেই বুকের ভিতরটা কেমন যেন হালকা হয়ে গেল। অবশেষে কৃপা মিলল।

অতর্কিতে বদলে গেল চারপাশ। সেনাছাউনি আসার বেশ কয়েক কিলোমিটার আগে থেকেই সবুজের সঙ্গে প্রকৃতির ছাড়াছাড়ি চোখে পড়ছিল। তবে পাহাড়গুলোর নীচের দিকে কিছু সবুজের উঁকিতে মনে হচ্ছিল যেন পাহাড়ের গায়ে শ্যাওলা ধরেছে। এবার সবুজের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ। এখানে প্রতিটি পাহাড় যেন একটা আলাদা অধ্যায়। কোনটা নিখুঁত ত্রিভুজের মতো, কোনটার মাথা যেন আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে আছে। কোনটায় আবার প্রকৃতি নিজের খেয়ালে ভাস্কর্য রচনা করেছে। কোথাও গুহার মতো, কোথাও বা দুর্গের মতো। কোথাও যেন একপাল ভেড়া চলেছে, কোথাও আবার sleeping lady। কোথাও আবার পাহাড়টা দেখে মনে হয় ঝুলবারান্দা সমেত পুরোনো কোন বাড়ি। এ দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া আমার মত সখের পর্যটকের সাধ্যের অতীত। আমি শুধু দুচোখ ভরে দেখি আর ছবি তুলে রাখি। এ দৃশ্যের কণামাত্রও যদি আমার প্রিয়জন, পরিচিত মহলে ভাগ করে নেওয়া যায়। মনে মনে ধন্যবাদ জানাই আমার আরাধ্য দেবতাকে। আমার মতো একজন নগণ্য মানুষকে এই ঐশ্বর্য দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন তিনি। এ দৃশ্য দেখলে বারবার একটাই কথা মনে হয়, এ বিশ্বচরাচরে কে আমি? কি আমার অস্তিত্ব? কতটুকু প্রয়োজন আমার আর কতটুকুই বা ক্ষমতা?

এগিয়ে চলেছি এবড়ো খেবড়ো পথে। মাথাটা একটু ভার ভার লাগছে। ড্রাইভার বলল 'ম্যাডাম খিড়কি থোড়া খোল দিজিয়ে'। আরে? এ ব্যাটা পাগল নাকি? বাইরে হাড়-কাঁপানো ঠান্ডা আর জানলা খুললেই কয়েক হাজার ছুঁচ ছুটে আসবে তিরের বেগে। জিজ্ঞাসা করলাম - কিঁউ ভাই? উত্তরে যা শুনলাম সে অভিজ্ঞতা খুব সুখকর নয়। জানতে পারলাম এখানে বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা খুব কম, আরো উপরে উঠলে আরো কমে যাওয়ার সম্ভাবনা, তাই বাহার সে থোড়া হাওয়া আনা চাহিয়ে। জানলার কাচটা একটু নামাতেই টের পেলাম প্রকৃতির মহিমা। যাই হোক বাইরে রোদ বেশ চড়া। এবার সামনে এল শেষ ধাপের দৃশ্য। পাহাড়ের রঙ বদলাতে লাগল। ধূসর পাথুরে রঙ থেকে বদল হল সজ্জা। এবার দেখা মিলল বহু স্বপ্নের

রজতগিরির। দু'ধারে সমস্ত পাহাড় বরফের আস্তরণে ঢাকা। কী অপূর্ব। যেন কোনো মহাযোগী শ্বেতশুভ্র বসনে ধ্যানে মগ্ন। মনে মনে বললাম—

ধ্যায় নিত্যম রজতগিরি নিভম মহেশম

ঘননীল আকাশ, যেখানে এক চিলতে সাদা মেঘেরও ঠাঁই নেই, তার ঠিক নীচেই চতুর্দিক সাদা, উদ্ভাসিত। এক একটা পাহাড়ে রোদ পড়ে চারিদিক ঝলমল করছে, আর তার পাশের পাহাড়টাতেই ছায়াঘন অন্ধকার। মনে হচ্ছে যেন ঠান্ডায় গুটিয়ে আছে।

এতক্ষণ যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম তা খুব চওড়া নয়। এবার উঁচু নীচু পথে চলতে চলতে বেশ প্রশস্ত একটা জায়গায় এসে পড়লাম। মাথাটা এবার একটু বেশিই ভার ভার লাগছে। নিজের একটু অবাকই লাগছিল। অনেকের কাছেই গল্প শুনেছি গুরুদংমার দেখতে গিয়ে অনেকেই অসুস্থ বোধ করেন। শুনে একটু আশ্চর্য লেগেছিল। বোধহয় প্রচ্ছন্ন একটু অহংকারও হয়েছিল। পায়ে হেঁটে পাহাড়ের বেশ অনেকটা উচ্চতা ওঠার অভিজ্ঞতা তো আছে। গাড়িতে যেতে অসুস্থ হয়ে যাব? প্রকৃতি বোধ করি আমার অর্বাচীন চিন্তা দেখে আড়ালে হেসেছিলেন। এ জায়গায় সত্যিই কিছু গোলমাল আছে। চিন্তা করতে করতে অনুভব করছি মাথাটা একটু বেশিই ভার লাগছে। মনে হচ্ছে চোখটা বন্ধ রাখলে ভালো লাগবে। কিন্তু না। যেমন করে হোক তাকিয়ে আমাকে থাকতেই হবে। পাহাড়ের প্রতিটি বাঁকে বিস্ময়, প্রতি মুহূর্তে বৈচিত্র্য, প্রতি পলকে অপার আনন্দ। এবার এই প্রশস্ত জায়গাটায় গাড়ি একটু দাঁড়াল। উল্টো দিক থেকে একটা গাড়ি আসছে। ঘড়িতে সকাল ৮টা। উল্টোদিকের গাড়ির যাত্রীদের দেখে মনে হল, আহা ওরা কত ভাগ্যবান, দেখে ফিরে এল। পাহাড়ে প্রতি পদে অনিশ্চয়তা। মন সবসময় প্রমাদ গোণে। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলাম, ঔর কিতনা দূর ভাইয়া? উত্তর এল — বস আ চুকে। একটু যেন আশ্বস্ত হলাম। গন্তব্য প্রায় এসে গেছে। মিনিট দশেক পরে একটা উঁচু জায়গায় গাড়িটা দাঁড়াল। দেখলাম আশেপাশে অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির দরজাটা খুলতেই যথেষ্ট রোদের মধ্যেও ঠান্ডাটা ভালোই মালুম হল। চারিদিক ধূ ধূ প্রান্তর। নদী নালা, গাছপালা, জনবসতি সমস্ত কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন। অখন্ড নীরবতা আর অপার বিস্ময় ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। কিন্তু যা দেখতে এলাম সে কই! ড্রাইভার বলল, থোড়া পয়দল চলা যাইয়ে। পা টা বাড়াতেই মনে হল শরীরের উপর বোধহয় পুরো বশ নেই। গাড়িতে রাখা বোতল থেকে দু ঢোঁক জল খেলাম। মিনিট দুয়েক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম। উপভোগ করলাম চারিদিকের শোভা। আর অসুবিধা হচ্ছে না। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম আর একটু। যেখানে এসে দাঁড়ালাম, তার উপরে আর যাওয়ার রাস্তা নেই। এবার আনত দৃষ্টি। গুরুপদ দর্শনে যেমন মাথা উঁচু রাখা যায় না, ঠিক সেরকম। তাকিয়ে দেখলাম যেখানে দাঁড়িয়ে আছি যেখান থেকে খাড়া পাহাড়ের ঢাল অনেকটা নেমে গেছে। সে ঢালের শেষে সে স্বপ্নের জলাভুমি, গুরুদংমার হ্রদ। সমস্ত হ্রদটা জমে বরফ। যেন বিশাল একটা থালা। ঠিক যেখানে পাহাড়ের ঢাল আর জলের সংযোগ, সে বরাবর ঘননীল জল যেন একটা নিখুঁত বলয়ের আবর্তে ধরে রেখেছে ঐ বিশাল বরফের থালাটা। ইন্টারনেটের দৌলতে কোনো বিখ্যাত জায়গার ছবি দেখা এখন পুতুল খেলার মতো। আমিও অনেক ছবি দেখেছি গুরুদংমার-এর। তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জল আর বরফের সহাবস্থান ধরা পড়েছে। কিন্তু যে গুরুদংমার আমি চর্মচক্ষে দেখতে পাচ্ছি তার কোনো মিল আমার আগের দেখা ছবিগুলোর সাথে পাচ্ছিনা। এটাই বোধহয় গুরুকৃপা। এই জলরাশি রয়েছে হিমালয়ের প্রত্যন্ত প্রান্তে। জনমানবহীন এই এলাকার উচ্চতা প্রায় ১৮০০০ ফুট মানুষের বাসযোগ্য নয় এই জায়গা। কী অনাবিল সৌন্দর্য! নীল জলের বলয়ের মধ্যে ডিস্কের আকৃতির বরফ যেন স্বর্গের কোনো শিল্পীর তৈরী নাট্যমঞ্চ। চারিদিকের বরফের পাহাড়গুলো যেন এইখানে মঞ্চস্থ হওয়া স্বর্গীয় বিনোদনের নীরব প্রাজ্ঞ দর্শক। যেদিকে দুচোখ যায় ঘননীল আকাশে হেলান দিয়ে আছে সারি সারি পাহাড়। যেন বিভিন্ন স্তরের দর্শকের গ্যালারি। নীল জলরেখার ধার ধরে উড়ছে লাল নীল বিভিন্ন রঙের পতাকা। তিব্বতি পর্যটকদের রেখে যাওয়া নৈবেদ্য। যেদিকে দাঁড়িয়ে আছি, তার ঠিক উল্টো দিকে একইরকম উঁচু জায়গা রয়েছে। সেখানে সারি সারি পাথর সাজানো আছে। যার একসারি থেকে আর এক সারি অবধি টেনে রাখা আছে বিভিন্ন রঙের পতাকা, যার মধ্যে ভগবান বুদ্ধের প্রতি প্রণাম নিবেদন করা আছে। এতটা উচ্চতায় দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু সেভাবে পাহাড়ি হাওয়া অনুভূত হচ্ছে না। পাহাড়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে যেটুকু জানা আছে এই উচ্চতায় হাওয়া শুরু হতে আরো কয়েক ঘণ্টা বাকি। হ্রদের বরফের ডিস্কটা থেকে চোখটা যেন সরাতে ইচ্ছা করছে না। যদিও দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য উঁচু জায়গাটা জাল দিয়ে ঘেরা আছে, তবু অতি কৌতূহলী কিছু পর্যটক বোল্ডার ভেঙে ভেঙে নীচে নামছে। হয়তো বা আরো কাছে যেতে চায়, স্পর্শ করতে চায় প্রকৃতির এই অমূল্য সম্পদকে। চোখ তুলে একটু ডানদিকে তাকাতে অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল। গুরুদংমার হ্রদের উত্তর পশ্চিম কোণের পাহাড়চূড়ার আকৃতি অবিকল মহাদেবের পরম ভক্ত নন্দীর মত। যেন অবিচল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জগপ্রগুরুর এই অপরূপ সৃষ্টির দিকে। হয়তো বা চোখের ভুল, কিংবা অলীক কল্পনা। যাই হোক না কেন কল্পনার তো কোন বিধিনিষেধ নেই। পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে মনে হল যেন গুরুভজনায় নিবেদিত পরমেশ্বরের পরমভক্ত যুগ যুগ ধরে উপভোগ করছে ব্রহ্মান্ডের কর্মকান্ড।

আর নয়। আর বেশি সময় থাকলে শ্বাসের সমস্যা হতে পারে। ড্রাইভার কানের কাছে এসে বলে — ম্যাডাম অব চলনা হোগা। জাগতিক এই বিস্ময়ের দিকে আমি যেরকম শিশুর মত তাকিয়েছিলাম তাতে ও বেচারাও আমাকে ফিরতে বলতে একটু ইতস্তত বোধ করছিল। অগত্যা নিরূপায় হয়ে ফিরিয়ে দিল আমার সম্বিত। আমিও পা বাড়ালাম। বারবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে থাকি এই নিশ্চল জাগতিক বিস্ময়কে। আর কখনো আসতে পারব কিনা পরমগুরুই জানেন। তবে যা সঞ্চয় করে নিয়ে গেলাম তা ইহকালের পরমরতন। নতমস্তকে

আবার প্রণাম জানালাম স্রষ্টার চরণকমলে। গাড়ি চলতে শুরু করল ফিরতি পথে। মনটা একটা অদ্ভুত প্রশান্তিতে ভরে গেছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন বার বার মনে হতে লাগল, কেন এই জায়গায় এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন অনেকে। উচ্চতাজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার মত উচ্চতা তো এই জায়গার নয়! তবে কি অন্য কোনো প্রাকৃতিক কারণ আছে? ড্রাইভারকেই জিজ্ঞাসা করে ফেললাম। যা জানা গেল তা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। এই জায়গায় আসার জন্য পর্যটকরা যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেন সেই লাচেন এর উচ্চতা কম বেশি ৯০০০ ফুট। গুরুদংমার -এর উচ্চতা ১৭২০০ ফুট। অঙ্কের হিসাবে প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু এই দ্বিগুণ উচ্চতায় উঠতে যে দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় তার দৈর্ঘ্য মাত্র ৬৭ কিমি। এত অল্প দূরত্বে এতটা উচ্চতায় উঠে আসা শরীরের পক্ষে মানিয়ে নেওয়া সহজ নয়। তার উপর খুব কম সময়ের মধ্যে বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা আকস্মিকভাবে কমে যায়, যার ফলে মস্তিষ্কে স্বাভাবিক অক্সিজেন পৌঁছতে পারে না। মাথা ভার লাগে, শরীর অবশ লাগে, শ্বাসের কষ্ট হতে পারে বা আরো অন্য অস্বস্তিকর উপসর্গ দেখা যেতে পারে। বুঝলাম পাহাড় বিষয়টা কত জটিল। এই সব কথা বলতে বলতে গাড়ি ছুটে চলল। আবার দেখা দিল লাস্যময়ী লাচেন। বেলা বেড়েছে চারিদিকের দৃশ্যপটও বদলেছে। দুধারে বরফ-ঢাকা পাহাড়গুলোর মাথা থেকে উঠতে শুরু করেছে বরফ-বাষ্প। যেন পরমগুরুর রান্নাঘরে জ্বলে উঠেছে হাজার হাজার উনুন। অবশেষে দেখা হল গুরুদংমার, সার্থক হল স্বপ্ন। এত আনন্দের মধ্যেও চোখের এককোনে জল এল। মনে পড়ে গেল আগের বারের যাত্রার অন্যতম ডাকাবুকো এক সাথীর কথা, যিনি ইতিমধ্যে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছেন। একজন আর একজনের চোখ দিয়ে কিছু দেখতে পায় কিনা আমি জানিনা। অনেক সময় আবেগের বশে ভালোবাসার মানুষদের আমরা সেকথা বলি। যদি সত্যি তেমন দেখা সম্ভব হয় তবে আমার আজকের দেখা সমস্ত দৃশ্য, আমার সমস্ত সঞ্চিত পরমরতন আমি সেই সাথীকে উৎসর্গ করলাম।

ব্রহ্মানন্দং পরম-সুখদং জ্ঞানমূর্ত্তিম
দ্বন্দ্বাতীতং গগন-সদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতম
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদগুরুং তং নমামি।

চারখোলের চার রাত

অংশুমান সরকার
অধ্যাপক, কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ

প্রথম পর্ব

"অ্যাঁ, আপনারা চার রাত থাকবেন শুধু চারখোলেতে ?"

বেশ লজ্জা পেয়ে গেছিলাম প্রশ্নটাতে। হোটেল-এর এজেন্ট নিজেই যখন এত অবাক হচ্ছেন, তখন নিশ্চয়ই চার দিন থাকার মতো কিছুই নেই ওখানে। কিন্তু আমাদের গ্রুপের বেড়ানোর ধরনটা একটু অন্যরকম, তাই ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম— "আপনি শুধু বলুন যে ওখান থেকে একদম নিরিবিলিতে পাহাড়, কুয়াশা, নৈঃশব্দ আর কাঞ্চনজঙ্ঘা উপভোগ করা যাবে তো?"

বিপ্রনাথবাবু আশ্বাস দিয়েছিলেন – 'তা যাবে'। পরে দেখেছিলাম তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। ভাগ্যিস সেদিন ওনাকে ভরসা করে জানুয়ারির ৪ তারিখের টিকিট কেটে ফেলেছিলাম।

কোথায় যেন পড়েছিলাম – 'নিশির মতন, পাহাড়ও নাকি নিজের দিকে ডাকে', কথাটা বোধহয় ঠিকই। তাই প্রতি বছর লাগেজ গুছিয়ে আমরা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ি নতুন কোনও পাহাড়ি স্পট-এর উদ্দেশ্যে। এবার তো আমার বন্ধু বিপ্লবের স্ত্রী রিম্পা একটু রাগ করে বলেই ফেলল – 'তোমরা যদি ফের NJP-র টিকিট কাটো, তাহলে আমি কিন্তু আর যাব না'। তবে এবারে আমাদের দলটা একটু ছোটো – মানে আমরা চার বন্ধু আমি, প্রদীপ, বিপ্লব, প্রসেনজিৎ আর আমাদের পরিবার, সব মিলিয়ে বারো জন। এবার আমাদের দলের নিয়মিত মেম্বার স্বরাজ যায়নি।

দার্জিলিং মেল ছাড়ল ঠিক রাত আটটায়। কয়েকদিন ধরেই খবর রাখছিলাম যে ট্রেন প্রায় রোজই এক -দু ঘন্টা করে লেট করছে। তাই শিলিগুড়িতে Jungle Safari করে তারপর চারখোলের দিকে রওনা দেবার প্ল্যান করা থাকলেও, মনে একটু ভয় ছিল। এর আগে বেশ কয়েকবার আমরা এই সাফারিটা দেখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। ভোররাতের দিকে মোবাইলে ট্রেনের গতিবিধি check করে দেখে, প্রদীপকে নিশ্চিন্ত করলাম যে এখনও no delay দেখাচ্ছে। পারমিতা, মানে আমার সহধর্মিণী বিজ্ঞের মত জানালেন – 'ট্রেনটা যা জোরে ছুটছে, তাতে বোঝাই যাচ্ছে যে লেট করবে না।' যাই হোক শেষমেশ প্রায় চল্লিশ মিনিট লেট করার পর NJP পৌঁছালাম। দুটো গাড়ি আগে থাকতেই ঠিক করা ছিল। ড্রাইভার কাশিমের কাছে মালপত্র সমেত বউ-বাচ্চা জমা রেখে, প্রতিবারের মতো খুচরো কিছু জলখাবারের সরঞ্জাম, যেমন কর্ণফ্লেক্স, গুঁড়োদুধ, ম্যাগি, ডিম, মুড়ি, চিঁড়ে, বিস্কুট ইত্যাদি কিনে ফেললাম। এটা প্রতিবার আমাদের Breakfast-এর একটা বড়ো খরচ বাঁচায়। এরপর সোজা চলে গেলাম শিলিগুড়ি শহরের এক প্রান্তে (মানে যে দিক দিয়ে বাগরাকোট যেতে হয়) Jungle Safari-তে। আমাদের মূল আকর্ষণ ছিল Tiger Safari-র প্রতি, কিন্তু জানলাম যে শুধুমাত্র সেটা আলাদা করে করা যায় না। তাই Herbivores-এর সঙ্গে Tiger Safari-র combo ticket কাটলাম একশো টাকা মাথাপিছু। শুনলাম সাফারির গাড়ি নাকি এখন ভিতরে গেছে, তাই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে – অন্তত আধ ঘন্টা। ভালই হলো, এই ফাঁকে আমাদের ছোট্টো সদস্যরা মানে আমার মেয়ে রাই, আর তার সঙ্গী গুনগুন, আদি আর শালিনী একটু খেলার সুযোগ পেয়ে গেল। একটু পর দেখি কাচের বড়ো জানলাওয়ালা একটা ছোটো মিনিবাসের মতো গাড়ি, তাতে গোটা কুড়ি আসন। দেখেই বেশ রোমাঞ্চ হয়। যদিও একটু চিন্তাও ছিল – চারদিক বন্ধ, এতজন লোক, শীতকাল, ট্রেনজার্নি করে আর রাতে অত কিছু খেয়ে উঠেছে, কী জানি কী হয়!!

এবার আসি সাফারির কথায়। যারা এখনও যাননি, তাদের বলব, অবশ্যই যান। সাধারণত শিলিগুড়ি থেকে পাহাড়ে ওঠার দিনটা সকলের একপ্রকার নষ্টই হয়। তাই বলি – না হয় দু'ঘন্টা পরেই গন্তব্যে পৌঁছবেন, না হয় গাড়িকে তিনশো টাকা বেশিই দেবেন waiting charge বাবদ। তবুও যান, না হলে কিন্তু অনেক কিছু মিস করবেন। ঘেরা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গাড়ি চলল, কত যে হরিণ আর ময়ূর দেখলাম তার ঠিক নেই। এমন কি, একটা গোঁয়ার টাইপের ময়ূর তো শীতকাল নাকি বর্ষাকাল এসব নিয়মের তোয়াক্কা না করে পেখম তুলে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। নেহাত গাড়ির বাইরে শব্দ যায় না, না হলে পারমিতা, লতা, সুমনা আর রিম্পা যা করছিল, তাতে আমি নিশ্চিত যে কোনো জানোয়ার আর ত্রিসীমানায় থাকত না। বিপ্লব মাঝে মাঝে হুংকার দিচ্ছিল – 'কেউ কথা বলবে না', আর তারপরই প্রত্যেকে একবার করে সে কথাটাই দ্বিগুণ উৎসাহে অন্যদের বোঝাবার চেষ্টা করছিল। আমার কেবল মনে হচ্ছিল যে, যদি এগুলো দেখতে নাও পেতাম তাহলেও কোনো ক্ষোভ থাকত না, কারণ ভিতরের জঙ্গলটা এত সুন্দর আর গভীর, যে শুধু প্রকৃতি দেখেই মন ভরে যায়। এক কথায় অতুলনীয়। চমকের আরও বাকি ছিল। Herbivores সাফারিটা শেষ হবার একটু আগে থাকতেই প্রদীপ আন্দাজ করেছিল যে আরও একটা safety gate জাতীয় কিছু থাকবে Tiger safari-র আগে। ঠিক তাই Tiger safari-র double locking gate দেখে বুঝলাম যে সতর্কতা যথেষ্টই। ভিতরে ঢোকার পর বেশ কিছুক্ষণ চলার পরও কিছু দেখতে না পেয়ে সকলে অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। আমি লক্ষ করছিলাম যে, মাঝে মাঝে wireless যন্ত্রে গাড়ির driver-এর কাছে কিছু কিছু নির্দেশ আসছে। সেই রকমই একটা

আওয়াজ পেয়ে গাড়িটা হঠাৎ থেমে গেল। তারপর দেখলাম একটা বিশাল আকারের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার হাঁটতে হাঁটতে আমাদের গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। কী অপূর্ব তার চেহারা, কি দৃপ্ত তার হাঁটা তা বলে বোঝানো যাবে না। প্রায় সাত-আট মিনিট ধরে সে চলল আমাদের গাড়ির পাশে পাশে। তারপর হারিয়ে গেল জঙ্গলের গভীরে। তখন আমাদের মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। সাফারি শেষ করে, বাগরাকোটে দুপুরের খাওয়া সেরে যখন চারখোলের দিকে রওনা দিলাম তখন ঘড়িতে প্রায় দুপুর ২.৩০টে।

দ্বিতীয় পর্ব

রাস্তার বর্ণনা আর দেব না। যারা পশ্চিম সিকিমে বা এদিকে রিস্যপে গেছেন তারা নিশ্চয়ই আন্দাজ করে নিতে পারবেন। তবে রাস্তার এতটা বেহাল অবস্থা বোধহয় আর কোথাও দেখিনি। আমাদের ড্রাইভার কাশিমের মতে এই রাস্তা নাকি বিগত পনেরো বছরেও সারানো হয়নি। তবে প্রকৃতি সমস্ত অভাব পূর্ণ করে দিচ্ছিল তার অপরূপ ছটায়। একটা কথা বলা দরকার, এদিকে দুটো রাস্তায় আসা যায়। একটা সেবক সেতু ধরে (যেটা আমাদের করা সম্ভব হয়নি, কারণ শিলিগুড়ির সাফারিটা শহরের অন্য দিকে পড়ে) আরেকটা হল বাগরাকোট হয়ে, অর্থাৎ যেদিক দিয়ে আমরা গেলাম। এই দ্বিতীয় রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত ছোটো, খারাপ এবং খাড়াই। তাই হঠাৎ করে altitude change হয়। আর যথারীতি এর কুফলগুলো প্রভাব ফেলতে থাকে। মানে, গা-বমি করা, মাথা ধরা, কান বন্ধ হয়ে যাওয়া – এই সব। আমরা তাই এর জন্য যথাযথ precaution নিয়েই রেখেছিলাম। সারাক্ষণ সবার মুখে ছিল – চিউয়িং গাম। বারে বারে জল খাওয়া চলছিল ইত্যাদি। চারখোলে পোঁছালাম প্রায় বিকেল ৫টা নাগাদ। অনেকক্ষণ ধরে সমানে চড়াই উঠতে উঠতে আন্দাজ করছিলাম যে – এত উপরে যখন উঠতে হচ্ছে তখন view টা নিশ্চয়ই ভালো হবে। কিন্তু ভাবতে পারিনি যে এমন মন ভরানো প্রায় ৩৬০° Panaromic view দেখতে পাব। তখন সূর্যাস্ত হতে চলেছে, গাড়ি থেকে নেমেই হাড়-কাঁপানো ঠান্ডা, বিশাল পাহাড়ের সারি, শিরশির করে হাওয়া দিচ্ছে, তার মধ্যে চোখের সামনে দেখছি কাঞ্চনজঙ্ঘার চুড়োয় সূর্যের শেষ আলো পড়ছে। সব মিলিয়ে অপার্থিব একটা পরিবেশ। বিপ্লব কানের কাছে ফিসফিস করে বলল – 'It's a perfect twilight…'

রিসর্টের ম্যানেজার বিকাশবাবুর সঙ্গে ফোনে আগেই আলাপ হয়েছিল। আমরা শিলিগুড়িতে থাকতেই ভদ্রলোক ফোন করে রাতের খাবারের অর্ডার নিয়ে নিয়েছিলেন। ভদ্রলোক আমাদের হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন, সেই সঙ্গে এও জানালেন যে উনি আলিপুরদুয়ারের লোক, এখানে গত ছ'মাস টানা একা আছেন। তাই বাঙালি দেখলেই ওনার নাকি খুব আনন্দ হয়। বোধহয় আরও একটু আলাপ করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আমাদের তখন মন টানছে রিসর্টের উপরে উঠে চারিদিকটা একেবার ভালো করে দেখতে। আমরা নিয়েছিলাম চারটে কটেজ। পাহাড়ের ঢালে ঢালে কটেজগুলো সাজানো। ডাইনিং হলের ছাদের উপর উঠে তবে কটেজগুলোয় যেতে হয়। কোনো রকমে মালপত্র ঘরে ফেলে, সেই ছাদ থেকে অবাক বিস্ময়ে আমরা চোখ ভরে নিতে লাগলাম পাহাড়ের গায়ে লেগে-থাকা সূর্যের শেষ আলো।

এইবার আসল মজার কথাটা বলি – এখানে ফোনের কোনো নেটওয়ার্ক কাজ করে না। একেবারেই যে করে না ঠিক তা নয়। কিন্তু গোটা এলাকায় কখন কোনখানে আপনি নেটওয়ার্ক পাবেন তা এক রহস্য। হাতে মোবাইল নিয়ে চলতে চলতে দেখবেন – এই আছে, এই নেই। আমরা একটা উঁচুমতো ভিউপয়েন্ট খুঁজে পেয়েছিলাম, যেখান থেকে মোটামুটি নেটওয়ার্ক পাওয়া যায়। রাতে দু-দুটো কম্বল নিয়েও ঠান্ডায় কাঁপা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করার ছিল না। পাহাড়ি জায়গায় সাধারণত প্রথম দিনটা ঠান্ডা একটু বেশিই লাগে, তারপরের দিন থেকে আস্তে আস্তে সয়ে যায়। তবে কটেজের এই ঘরগুলো বেশ গরম, সেটা হয়তো সারাদিন রোদ্দুর লাগে বলে। যাই হোক, পরদিন একটু ভোরে উঠব বলে ঠিক করে রেখেছিলাম, ইচ্ছা ছিল কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্যোদয় দেখব। হিসাব মতো সাড়ে পাঁচটা নাগাদ অ্যালার্ম দিয়েও রেখেছিলাম, কিন্তু একে সারাদিনের ক্লান্তি আর তার সঙ্গে সেইরকম ঠান্ডা। তাই কখন অ্যালার্ম বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়েছি তা বুঝতেই পারিনি। পারমিতার ডাকে ধড়মড় করে উঠে

মোবাইলে দেখি প্রায় ছ'টা বাজে। তাড়াহুড়ো করে কাচের জানলার পর্দা সরিয়ে যা দেখতে পেলাম তা ভাষায় বর্ণনা করা আমার কর্ম নয়। এটুকু বলতে পারি – আমি টাইগার হিল থেকে, আরিতার থেকে, কালুক থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্যের প্রথম আলো পড়তে দেখেছি। কিন্তু জানি না কেন মনে হল – এত সুন্দর বোধহয় আর কোথাও দেখিনি। ততক্ষণে আমার মেয়ে রাই ঘর থেকে বেরিয়ে হইচই ফেলে বাকি সকলের ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছে। আর আমরা সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রয়েছি মিনিটে মিনিটে পরিবর্তনশীল সেই আলোর খেলার দিকে।

সেই দিনটা কোথাও যাবার ছিল না, তাই তাড়া নেই। প্রদীপ আমার মতোই ভোরে ওঠে। একটু কফি পাওয়া যাবে কিনা খোঁজ করতে দুজনে তলায় নেমে দেখি রিসর্ট প্রায় খালি। রান্নাঘরে যে ছেলেটি রান্না করে তার নাম আমির। সদাহাস্যময় তরুণটিকে জিজ্ঞেস করলাম যে আমরা তার রান্নাঘর একটু ব্যবহার করতে পারি কি না? একগাল হেসে সে বলল – 'জি সাব, লেকিন হাম কো কেয়া করনা পড়েগা?' ব্যস, আর আমাদের পায় কে ? মুহূর্তের মধ্যে রান্নাঘর আমাদের দখলে, নিমেষের মধ্যে – কফি, ম্যাগি, ডিমসেদ্ধ, দুধ-কর্ণফ্লেক্স রেডি। এখানে একটা কথা বলা দরকার, এখানে খাবারের দাম খুব বিরাট কিছু বেশি নয়। মোটামুটি পাহাড়ে যেমন হয় প্রায় তেমনই। আর পরিমাণটাও বেশ ভালোই। আগেই খবর নিয়েছিলাম রিসর্টের পাশেই আরেকটা হোটেল আছে – Blue Pine Retreat। সেটার সামনে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা, যেখানে দোলনা ইত্যাদি আছে। ব্রেকফাস্ট সেরে, খুদেগুলোকে নিয়ে চলে গেলাম সেখানে। বেশ খানিকটা ছেলেমানুষি, বাঁদরামি করার পর মনে পড়ল যে আগামীকাল লাভা-লোলেগাঁও যেতে গেলে গাড়ির ব্যবস্থা করা দরকার। কারণ, এখানে সিন্ডিকেট-এর গাড়ি ছাড়া অন্য গাড়ি চলে না। এদের রেট ফিক্সড থাকে, তাই ঠকবার ভয় নেই। অবশ্য কেউ যদি পুরো ট্যুরের জন্য গাড়ি রেখে দেন তার কথা আলাদা। যাই হোক, বিকাশবাবু এখানের সিন্ডিকেটে ফোন করে আমাদের গাড়ি বুক করে দিলেন পরের দিন লাভা-লোলেগাঁও যাবার জন্য। গাড়ি পিছু রেট ৩২০০/- টাকা। পরদিন সকাল ন'টার সময় আসবে গাড়ি।

রোদপিঠ করে আড্ডা দিচ্ছি, এমন সময় বিকাশবাবু এসে বললেন – আজ তো আপনাদের কোনও প্রোগ্রাম নেই, তাড়াতাড়ি লাঞ্চ সেরে নিয়ে একটু যান না – ওই দিকের পথটায়। একটা ছোটো গ্রাম আছে, একটু দূরে একটা টাওয়ার আছে। রাস্তাটা খুব সুন্দর। এমনিতেই আমরা যেখানে যাই সেই জায়গাটা পায়ে হেঁটে চষে না ফেলে শান্তি পাই না। সুতরাং এই প্রস্তাবে রাজি না হবার কোনো কারণ ছিল না। খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়লাম Trekking-এ। রিসর্টের একজন কর্মী, নাম 'চান্দা' আমাদের সঙ্গে চলল গাইড হয়ে। আমি আর বিপ্লব একটু গাঁইগুঁই করছিলাম – 'সবে খেয়ে উঠলাম, এতটা হাঁটা'। প্রসেনজিৎ আবার এই সব বিষয়ে খুব উৎসাহী। জানিয়ে দিল যে – এমন virgin nature ও নাকি কোথাও দেখেনি। তাই একে যতটা সম্ভব উপভোগ করে নিতে হবে। হাঁটা শুরু হতেই প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম প্রায় – শুরুটাই বেশ খাড়াই পথ। অবশ্য পথ না বলাই ভালো। পাহাড়ের গায়ে পাশাপাশি দু'জন হাঁটতে পারে এমন একটা রাস্তা। কিন্তু সেই রাস্তা যত এগোতে লাগল ততই তার অসাধারণ রূপ সামনে আসতে লাগল। চান্দা'দিদি দূরে পাহাড়ের গায়ে কয়েকটা বাড়ি দেখিয়ে বললেন – 'উস গাঁও মে যায়েঙ্গে সাব'। শুনে তো আমি হতবাক! বলে কি? ওই অত দূরে ? আরও হতভম্ব হয়ে গেলাম পারমিতা, লতা, রিম্পা আর সেই সঙ্গে খুদেগুলোর আনন্দ দেখে – হ্যাঁ, যাব তো। কি মজা! কতদূর যাব!' ইত্যাদি ইত্যাদি...

যারা চারখোলে যাবেন, তাদের বলছি – আর যাই করুন না কেন, এই Trek-টা অবশ্যই করবেন। আর প্রাণ ভরে শ্বাস নেবেন, দেখবেন প্রকৃতির কেমন একটা নিজস্ব গন্ধ আছে, যেটা আমরা সচরাচর পাই না। পাহাড়ি গ্রামটায় গেলাম, দেখলাম সেখানে তারা সেখানে আখের গাছ করেছে, কৃত্রিম উপায়ে মৌচাক বানিয়ে মধু উৎপাদন করছে,

পাহাড়ি ছাগলের লড়াই দেখলাম, আরও কত কি। প্রদীপ আর আমার গিন্নি দেখলাম আলাপ জমিয়ে তাদের থেকে বেশ কিছু আখ জোগাড় করেছে। খেয়ে দেখলাম – বেশ মিষ্টি।

ফিরতে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমাদের এই 'চারখোলে রিসর্টে' বাচ্চাদের জন্য একটা খুব সুন্দর মিনি লাইবেরি আছে, রিসেপশান-এ। সেখানে দেখলাম ঈশপের গল্প, টিনটিন, ক্ষীরের পুতুল আর ছোটা ভীমের সাথে সাথে রবিনহুড আর রাস্কিন বন্ডও আছে। সেখানে আমাদের দলের পুঁচকেগুলো অনেকটা সময় কাটাত। আর আছে একটা বেশ বড়ো দশ বিছানার ডরমেটরি, যেখানে আমাদের আড্ডা চলত রোজ রাত এগারোটা-বারোটা পর্যন্ত।

তৃতীয় পর্ব

গুগুলে দেখেছিলাম যে লোলেগাঁও-এর উচ্চতা ১৬৭৫ মিটার। মানে চারখোলের প্রায় সমান। ভোরবেলা উঠে, তড়িঘড়ি করে তৈরি হয়ে নিয়ে, ব্রেকফাস্ট শেষ করতে করতেই গাড়ি এসে গেল। মনে মনে ভেবে বেশ ভয় লাগছিল যে ওই সাংঘাতিক ঢেউ খেলানো রাস্তা দিয়ে আবার নামতে হবে। ও বাবা, গাড়িতে উঠে দেখি বিপ্লব আর প্রসেনজিৎ হাওয়া। জানা গেল গাড়ির ঝাঁকুনি এড়াতে বাবুরা আগেই পাহাড় ভেঙে, পায়ে হেঁটে নিচের দিকে নেমে গেছেন। সিন্ডিকেট-এর ড্রাইভার দুজন – মিলন আর সন্দীপ দুজনেই দেখলাম খুব হাসিখুশি লোক। অবশ্য পাহাড়ি অঞ্চলের লোকেদের দেখেছি – এরা বেশির ভাগ সময়ই হাসিমুখে থাকে। যাই হোক, ঘন্টাখানেক চলার পর এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে সন্দীপ বলল – 'ইয়ে পাইন ফরেস্ট হ্যায় সাব, ফটো লিজিয়ে অন্দর যা কে।' নেমে দেখি অসাধারণ পরিবেশ। ঘন পাইন আর ওক গাছের বন, সূর্যের আলো ভিতরে অনেক জায়গায় খুব কম ঢোকে, তাই গাছের গায়ে ঘন শ্যাওলা। যে জিনিসটা আমার সব চাইতে বেশি ভালো লাগছিল সেটা হল pin drop silence, মনে হচ্ছিল যেন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন এই জগৎ। আর বিশাল উঁচু উঁচু গাছের ফাঁক দিয়ে কোনোরকমে গলে-আসা এক-আধ ফালি রোদ্দুর। জানলাম এই জায়গাটার নাম কাফের। কোনো একটা লেখায় পড়েছিলাম – 'It is a less trodden hamlet' মনে হচ্ছিল সত্যিই বোধহয় বেশি মানুষের পা এদিকে পড়েনি। পারমিতা দেখলাম খুব মন দিয়ে সবুজ শ্যাওলা ধরা গাছের ছবি তুলছে। বুঝলাম ওর নিজের প্রিয় বিষয় পেয়েছে – এটা তো আসলে একটা Cypress Forest মানে চিরহরিৎ উদ্ভিদের বন। তাই আপনি বছরের সব সময়ই একে সমান সুন্দর দেখতে পাবেন। ছেড়ে যেতে একদম মন চাইছিল না। কিন্তু মিলন আর সন্দীপ খুব তাড়া দিতে শুরু করেছিল, এমনকি শেষ দিকে 'ইয়াহা জঙ্গল মে লেপার্ড হ্যায়' ইত্যাদি ইত্যাদি। এখান থেকে লোলেগাঁও-এর হেরিটেজ ফরেস্ট আরও আধঘন্টার পথ। হেরিটেজ ফরেস্টের সামনে গিয়ে টিকিট (মাথাপিছু ২৫ টাকা) কেটে, পাশের ছোটো দোকানে চা খেয়ে, ভিতরে ঢুকে পড়লাম। এখানেই আছে – সেই বিখ্যাত Canopy Walk, মানে গাছের উপর ঝুলন্ত কাঠের তৈরি সেতু। লম্বায় প্রায় ১৮০ মিটার আর মাটি থেকে মোটামুটি

তিনতলা বাড়ির মতো উঁচু। দেখলাম লেখা আছে ব্রিজের উপর দুজনের মধ্যে কমপক্ষে চার ফুট দূরত্ব রাখতে হবে। ব্রিজটা আসলে সারাক্ষণই দোলে। তবে বেশ মজাদার এই দুলুনি। আমার কলেজের প্রিন্সিপাল ম্যাডাম বলেছিলেন যে সঙ্গে একটু নুন নিয়ে ঢুকতে, এখানে নাকি জোঁকের খুব উপদ্রব। কিন্তু এখন শীতকাল বলে তার আর দরকার হল না। উনিই বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রজাতির গাছ নাকি এই জঙ্গলে রাখা আছে। আমরা নির্দ্বিধায় যে যার ইচ্ছে মতো এক একটা গাছকে এক একটা নাম দিয়ে দিচ্ছিলাম, কেউ কিছু বলার নেই, কারণ গাছের ব্যাপারে আমাদের দলের সবার জ্ঞানই সমান। উত্তেজনার বশে একবার তো আমি একটা গাছের নেপালি নামও বলে ফেলেছিলাম। আসলে এই ফরেস্টের ভিতরটা ভীষণ সুন্দর, সেই সত্যজিৎ রায়ের 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় একটা ডায়লগ ছিল না - "এই বিশাল পাহাড়, এই রোদ, এই কুয়াশা, এই মেঘ... এরকম জায়গায় এলে সাহস টাহস সব কেমন বেড়ে যায়..."। চুপ করে একটু বসে থাকলে মনে হবে প্রকৃতি যেন ফিসফিস করে কথা বলছে। বসার জায়গাও আছে—বাঁশ আর গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি। সেই বেঞ্চগুলোয় দেখি স্থানীয় কিছু বয়স্কা মহিলা বসে আছেন। অবাক হলাম দেখে তার মধ্যে একজন আবার সাদা শাড়ি বাঙালিদের মতো করে পরে আছেন। প্রসেনজিৎ অভ্যেস মতো আদিখ্যেতা করে জানতে গেছিল – 'ইয়াহা নজদিক কোই কলেজ হ্যায়?' গম্ভীর গলায় 'কাং বং চুং'

টাইপের কিছু একটা উত্তর এল। আর আছে অজস্র নানান জাতের পাখি। কত অচেনা পাখি যে দেখলাম তার ঠিক নেই। যারা Bird watching করেন – এটা তাদের কাছে আদর্শ জায়গা। এর কাছেই একটা Sunrise Point আছে, নাম ঝানডি দারা। সেখান থেকে নাকি সিঙ্গালিলা রেঞ্জটা খুব ভালো দেখা যায়। প্রায় ঘন্টা দেড়েক লাগে এই Heritage Forest টা পুরো ঘুরে দেখতে। বেরিয়ে শুনি, গাড়ি নাকি খানিকটা এগিয়ে একটা বাজার মতো জায়গায় আছে, সেখানে হেঁটে যেতে হবে আর সেখানেই দুপুরের খাওয়া সারতে হবে। ভালোই লাগছিল হাঁটতে, বাচ্চাগুলোও দেখলাম খুব একটা ক্লান্ত হয়নি। একটা ছোট মতো দোকানে রুটি আর খুব ঝাল আলুর তরকারি কোনোরকমে খেয়ে একটু চা খেতে বুঝলাম খিদেটা ভালই পেয়েছিল। হোটেলে মুড়ি শেষ, এখানে দেখলাম মুড়ি পাওয়া যাচ্ছে, কিনে নিলাম। সেই সঙ্গে আমূলের দুধের প্যাকেট।

খাওয়া সেরে বেরোতে প্রায় দুটো বেজে গেল। এখান থেকে লাভা ২২কিমি, মানে আবার এক-দেড় ঘন্টার রাস্তা এবং আবার সেই খারাপ রাস্তা। তবে উচ্চতা খানিকটা বেশি – প্রায় ২১৩০ মিটার, তাই ঠান্ডাও বেশি। দূর থেকে পাহাড়ের গায়ে একটা জায়গায় প্রচুর বাড়িঘর দেখে বুঝতে পারছিলাম যে লাভা খুব ভিড়ভাট্টার জায়গা। গিয়ে বুঝলাম ঠিক তাই। গাদাখানেক হোটেল, বাজার আর টুরিস্ট মিলিয়ে একদম রথের মেলা। প্রদীপ চাপা গলায় বলল – 'এই রে! আবার কেনাকাটা শুরু হয়ে যাবে'। তাই বুদ্ধি করে গাড়ি থেকে নেমেই – 'দেরি হয়ে গেছে, এখনই Monastery বন্ধ হয়ে যাবে' এইসব বলে টলে একটা হইচই মতো লাগিয়ে দিলাম। আর অমনি সবাই দোকান-বাজারের দিকে না তাকিয়ে, হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল লাভা Monastery-তে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এটার আসল নাম Kagyu Thekchen Ling Monastery, তবে এটাকে এখানে 'রত্নঋষি বিহার গুম্ফা'ও বলে। শুনলাম এটা নাকি '১৯৮৭ সালে তৈরি। খুব সুন্দর পরিবেশ, আর এখান থেকে পুরো উপত্যকাটা খুব ভালো দেখা যায়। পাশের একটা মাঠে দেখলাম ছোটো ছোটো লামারা ফুটবল খেলছে। লেখা আছে যে ছবি তোলা বারণ, ওদিকে পারমিতারা দেখি লামাদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ভিতরে গিয়ে প্রার্থনার সময় বেশ ছবি-টবি তুলে

নিয়ে এল। সূর্য প্রায় ডুবতে চলেছে, আর ঠান্ডাও খুব লাগছে, তাই Monastery-র ক্যান্টিনে একটু কফি খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বেরিয়ে লক্ষ করলাম মিলন আর সন্দীপের মুখ কেমন যেন শুকনো। এও লক্ষ করলাম – দুজনে গুজগুজ করে কি সব কথা বলছিল। সেই সঙ্গে গাড়িতে উঠে দেখলাম অন্য একটা রাস্তায় চলেছি। জিজ্ঞাসা করলাম কী ব্যাপার। যা শুনলাম তাতে পিলে চমকে যাবার জোগাড়। যাবার সময়ে আমরা একটা গাড়িতে ছিলাম ছেলেরা আর একটা গাড়িতে ছিল মেয়েরা। আমাদের মানে ছেলেদের গাড়িটার নাকি হেডলাইট এখন ঠিক কাজ করছে না। রাস্তায় কোথাও একটা সারানোর চেষ্টা করা হবে। ততক্ষণ পিছনের গাড়ি আলো ফেলে আমাদের পথ দেখাবে। সেই কারণেই অপেক্ষাকৃত ভালো, মসৃণ রাস্তা বাছা হয়েছে। কিন্তু এই রাস্তার দূরত্ব বেশ খানিকটা বেশি পড়ে। কিন্তু এভাবে যাওয়া যায় নাকি? কিছু করার নেই। বেশ খানিকটা পথ এই ভাবে যাবার পর, সূর্য পুরো ডোবার পর একদম ব্ল্যাক আউট। পুরো অন্ধকার। একটা জায়গায় রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দুই মক্কেল গেলেন গাড়ির ব্যাটারি খুলে নিয়ে সারাতে। আর আমরা কচুবনে কানাই সেজে অনাথ অবস্থায় বসে রইলাম। এদিকে বাচ্চাগুলোর খিদেও পেয়েছে। গাড়ি থেকে নেমে দেখি ঠান্ডায় জমে যাওয়ার মতো অবস্থা। এর ওর ব্যাগ হাতড়ে বের হল বিস্কুট, চিঁড়েভাজা ইত্যাদি। আধঘন্টাটাক পরে মর্কট দুটো ফিরে জানালো – 'আজ লাইট ঠিক নেহি হোগা সাব।' বলে কি ? প্রসেনজিৎ আঁতকে উঠে জানতে চাইল – 'আমরা কি কাল পর্যন্ত এখানে দাঁড়িয়ে থাকব ?' একগাল হেসে সন্দীপ আশ্বস্ত করল – সে নাকি পনেরো বছর এই রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছে। তার সব বাঁক নাকি মুখস্থ। এখন আমরা যদি সাহস করে যাই তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না। সাহসের কথা শুনেই বাঙালি রক্ত গরম হয়ে উঠল। যা থাকে কপালে। পিছনের গাড়ির আলোয় পাহাড়ি বাঁকে গাড়ি চাপা যে কী – তা যে না চেপেছে সে বুঝতে পারবে না। তবে রিসর্টে ফিরে গাড়ি থেকে নেমে আমাদের জড়িয়ে ধরেছিল সন্দীপ।

রিসর্টে ঢুকে দেখি লোডশেডিং। বিকাশবাবু জানালেন যে আলো কোথাও খারাপ হয়েছে এবং এখানে নাকি এরকম হলে দু-তিন দিন পর্যন্ত আলো থাকে না। রিসর্টে যদিও জেনেরেটর আছে, তা শুধু

রাত দশটা অবধি চলবে। তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে আলো বন্ধ করে দিতে বললাম। তারপর মোমবাতি জ্বালিয়ে ডরমেটরিতে শুরু করে দিলাম আমাদের নৈশ আড্ডা।

চতুর্থ ও শেষ পর্ব

রাতে বেশ কয়েকবার ঘুম ভেঙে উঠে উঠে দেখেছি যে – কারেন্ট আসেনি। কানে বিকাশবাবুর কথাটা যেন বাজছিল – 'এখানে অনেক সময় দু-তিন দিন পর্যন্ত আলো থাকে না।' ভাবছিলাম যে, আমাদের এত দুশ্চিন্তা, কিন্তু এরা তো বেশ নিশ্চিন্তই আছে। আসলে পাহাড়ের মানুষদের দেখেছি চাহিদা খুব কম। তাই যে কোনো অবস্থাতেই এরা খুশি। ঘুম ভেঙে বসে বসে এই সব ভাবছিলাম, হঠাৎ দেখি আলো ফুটছে। কাচের জানলা দিয়ে ভোরের আলো ফোটা দেখতে দেখতে মনটা যেন কেমন শান্ত, চিন্তামুক্ত হয়ে গেল। আর মনে পড়ছিল 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র সেই দৃশ্যটা। যেখানে শেখর একটা Statesman পুড়িয়ে দিয়ে বলে – 'সভ্যতার সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ'।

হাতে মাত্র আরেকটা দিন আছে। তাই আগে থাকতে ঠিক করে রেখেছিলাম যে শেষ দিনের জন্য কিছু আনন্দ বাড়ি রাখতে হবে। কলকাতা থেকেই বিপ্রনাথবাবু আমাদের কথা দিয়েছিলেন যে একটা Complementary Bonfire-এর ব্যবস্থা করে দেবেন। শেষদিনেই সেইটা করার কথা। ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখি – চেয়ার পাতা, কাঠ-খড়ি আনা, প্রায় সব arrangement ready। আমরা আগের দিনই বিকাশবাবুকে জানিয়েছিলাম যে রাতে Bonfire-এর সময় আমরা তন্দুরি চিকেন খেতে চাই। ভদ্রলোক দেখলাম এব্যাপারে খুব উৎসাহী। বললেন – এখানে রিসর্টের ছেলেরা চিকেন তন্দুরি একদম পুরো preparation করে প্লেটে করে আপনাদের Bonfire-এর সময় দিয়ে দেবে।

– কত পড়বে ?

– কিলো পিছু ৬৫০ টাকা।

– কিলোতে কতগুলো পিস হবে ? আমার অর্ধাঙ্গিনী জানতে চাইলেন। উনি এসব ব্যাপারে বেশ পাকা।

– কি দিয়ে ম্যারিনেট করবেন ? লতা আবার এককাঠি বাড়া।

বিকাশবাবু দেখি নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। আমতা আমতা করে জানালেন যে কিলো পিছু মোটামুটি ১৫-১৬ টা ভালো পিস হয়। এদিকে বিপ্লব দেখি একজন স্থানীয় বয়স্ক লোকের সঙ্গে কথা বলছে। কাছে যেতে বলল – 'ইনি এই পাহাড়টার মালিক, এনার আরও একটা পাহাড় আছে।' শুনে খুব অবাক লাগল। বললাম – 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন যে তার একটা পাহাড় কেনার শখ। এনার সঙ্গে আলাপ হলে বোধহয় খুশি হতেন।'

প্রদীপ দেখি সাত সকালেই সেই উঁচু টিলাতে উঠে বসে আছে। চেঁচিয়ে বলল – 'ওদিকে দ্যাখ সামনে তাকিয়ে দেখি ঝকঝক করছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। আর এসব বকবক কি ভালো লাগে ? লাফাতে লাফাতে টঙে উঠে গেলাম। একে একে সবাই এসে জুটল সেখানে। তারপর যা হয়। প্রাণ ভরে অক্সিজেন, চোখ ভরে প্রকৃতি, আর মন ভরে স্মৃতি নেওয়া। রাতে আগুন জ্বালিয়ে খুব নাচানাচি হল। বিকাশবাবু নিজেই একটা ছোটো Bluetooth Speaker লাগিয়ে গান চালিয়ে দিলেন। নাচলেনও আমাদের সঙ্গে। একবার এও জানালেন যে এই Speaker-এর ভাড়া ২৫০ টাকা। তারপর নিজেই লজ্জা পেয়ে বললেন – 'না না, কিছু দিতে হবে না।'

চারখোলে রিসর্টের ডাইনিং হলে একটা সাদা দেওয়াল আছে, যেখানে নানান কিছু লেখা আছে। যারা এখানে ঘুরতে আসে – এই দেওয়ালে তাদের ইচ্ছামতো কিছু লিখে যায়। আমরাও পরদিন সকালে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেবার আগে সেখানে কত কী লিখলাম।

কি লিখলাম ? বলব না। সেটা জানতে গেলে আপনাদের যেতে হবে ওই পাহাড়ি নিঃশব্দ খাদের ঢালে।

অভিশপ্ত কলম

বীরেশ্বর ধানকী
দ্বিতীয় সেমেস্টার, রসায়ন বিভাগ

অফিস ফেরতা অরিন্দমবাবুর তাড়াহুড়ো করার একটা কারণ ছিল। অফিসে থাকাকালীন বিপ্লব চ্যাটার্জী লেনিন অ্যান্টিক এন্টারপ্রাইজের প্রোপাইটার সুজিত বোস, অরিন্দমবাবুকে বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ দেখা করতে বলেছেন। আসলে অরিন্দমবাবু বিভিন্ন অ্যান্টিক জিনিস কেনেন। বলতে গেলে ওটা তার বহু শখের মধ্যে একটা। তিনি শুধু সুজিত বোস এর দোকান থেকেই জিনিস কেনেন এমন নয়, বিভিন্ন নীলাম ঘরেও যান। মাঝেমধ্যে দামি জিনিস কিনতে তিনি কখনও কার্পণ্য করেন নি। তার টাকার অভাব নেই। ছেলেমেয়ে নেই। স্ত্রীও বছর চারেক আগে চলে গিয়েছে। সুতরাং তিনি যা আয় করেন, বেশিরভাগই অ্যান্টিক কেনার জন্য ব্যয় করেন। আর এই করেই তিনি বৈঠকখানার অর্ধেক ভরিয়ে ফেলেছেন।

কলকাতার ভিড়ের শনিবারে ঠেলেঠুলে কোনোমতে তিনি যখন অ্যান্টিক এন্টারপ্রাইজে উপস্থিত হলেন, তখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা বাজতে সামান্যই বাকি। সেই সময় সুজিতবাবু ফাঁকায় ছিলেন। বললেন, ‘কি ব্যাপার মশায়, আপনাকে যে আর দেখাই পাওয়া যায় না, তা মশাই, ভালো একটা এন্টিক জিনিস এসেছে। নেবেন নাকি? ভালো একটা বিলিতি কলম বহু বছরের পুরোনো। দাঁড়ান আগে দেখাই।’

এই বলে ভেতর থেকে একটা পুরনো কাঠের বাক্স নিয়ে এলেন তিনি, দৈর্ঘ্য ১২ ইঞ্চি প্রস্থে ৫ ইঞ্চি তো হবেই। ভেতরে ফাউন্টেন পেনের অনুরূপ একটা কলম। দামি কোম্পানির নাম, মালিকের নাম, সোনার জলে এখনও জ্বলজ্বল করছে । অরিন্দমবাবু পড়লেন, অবনী বন্দোপাধ্যায়, সাল ১৮১৫। মানে একশো বছরের পুরনো। তিনি কলমটা কিনে নিলেন। তবে কলমের মুখটা সামান্য বাঁকা আর নিবটা রুপোর তৈরি। তিনি পুরোনো নীল কালিও খুঁজে পেতে কিনলেন। বাড়িতে ফিরে কলমটা আলমারিতে না সাজিয়ে রেখে ব্যবহার করার কথা ভাবলেন। তাই কলমটা পরিষ্কার করা হল। আর কালিও ভরা হল। অরিন্দমবাবু দেখলেন কলমটা এখনো কার্যক্ষম, কিন্তু বুঝতে পারলেন না তিনি কী বিপদে পড়তে চলেছেন।

তিনি সেই কলমে এত অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন যে, পকেটে নিয়ে বেরোতে শুরু করলেন। কিন্তু একটা ব্যাপার তিনি লক্ষ করলেন না যে, কলম এর সংস্পর্শে এলে তার রাগ হিংসা হঠাৎ হঠাৎ প্রকাশ পায়। একদিন অফিসে তার একজন কলিগকে কলমটা ছুরির মতো ধরে মারতে গেলেন। কিন্তু চারপাশে অন্যান্যরা ছিল, তাই রক্ষে। না হলে এতদিনে তাকে হাজতে থাকতে হত। বাড়িতে কলমটা নিয়ে লেখার সময় হাত নিশপিশ করে, কারো বুকে বসিয়ে দেওয়ার জন্য। কিছুদিন পর তিনি এই ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন, কিন্তু কলমটা এত সুন্দর যে তিনি তা ত্যাগ করার কথা চিন্তা পর্যন্ত করতে পারলেন না।

মাসখানেক পর সেই মায়া তাকে ত্যাগ করতেই হল। ২৫শে এপ্রিল বুধবার সেই দিনের কথা অরিন্দমবাবু জীবনে কখনো ভুলবেন না। অফিসে এত কাজ ছিল যে বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়া জামাকাপড় ছাড়ার কথা ভাবতেও পারলেন না। জুতো খুলে একেবারে বিছানায়। ঘন্টা দুয়েক পর তার ঘুম ভেঙে গেল। দুজনের কণ্ঠ কথা শোনা যাচ্ছে না? কিন্তু বাড়িতে তো তিনি একা! একি! তার ঘরেই দুজন লোক দুটো চেয়ারে বসে কথাবার্তা বলছে! ধীরে ধীরে তাদের গলা সপ্তমে চড়তে আরম্ভ করল। তাদের কথাবার্তা থেকে অরিন্দমবাবু বুঝতে পারলেন, একজন অবনী, আরেকজন সন্দীপ আর তাদের ঝগড়ার কেন্দ্রে একটি মেয়ে। কিন্তু অরিন্দমবাবু বুঝতে পারলেন না তার বাড়িতে তারা ঢুকল কী করে? আর চোর যদি বা হবে, তবে তারা মালিকের সামনে কোন একটা পারমিতা নামের মেয়েকে কেন্দ্র করে ঝগড়া করে কী করে? দুজনের চেহারা পোশাক দেখে তো মনে হয় তারা ভদ্রঘরের সন্তান। কিন্তু একি! সন্দীপ অবনীর সামনে রাখা অবনীর কলমটা নিয়ে তার বুকে বসিয়ে দিল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে লাগল। কিছুক্ষণ পর অবনীর মাথা একদিকে হেলে পড়ল। অরিন্দমবাবু দেখেশুনে বোবা হয়ে গেলেন। চিৎকার করতে গিয়ে দেখলেন গলা শুকিয়ে কাঠ। সন্দীপ কী করল, একটা মেয়ের জন্য সে তার এতদিনের বন্ধুকে হত্যা করল। অরিন্দমবাবু আর দেখতে পারলেন না, চোখ বুজে ফেললেন। কিছুক্ষণ পর চোখ খুললেন কিন্তু সব ফাঁকা। টেবিলে শুধু তার কলমটা পড়ে রয়েছে। ফিনকি দিয়ে বেরোনো রক্তের কোনো চিহ্ন নাই। ঘরে শুধু তার কলমটা। এতো লাল কেন কলমটা? রক্ত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

অরিন্দমবাবুর মনে পড়ল কলমটার ওপরে লেখা নাম অবনী। তাহলে কি ত্রিকোণ সম্পর্ক আর তার জেরে হত্যা? তিনি বুঝতে পারলেন কলমটা হাতে থাকলে, কেন এত হিংসার উদ্রেক হয়। তিনি মনস্থির করে ফেললেন না আর কলমটা তার নিজের কাছে রাখা নিরাপদ নয়। বাকি রাতটুকু তিনি জেগেই কাটালেন। পরের দিন সকালে অফিসে যাওয়ার সময় হাওড়া ব্রিজের উপর থেকে গঙ্গার বুকে ফেলে দিলেন সেই রক্তমাখা অভিশপ্ত কলমটাকে। মনে মনে অবনীর আত্মার শান্তি কামনা করলেন। অরিন্দমবাবু আবার অফিসে শান্ত নিরীহ গোবেচারা করণিকে পরিণত হলেন।

আঁশু

সঞ্জীব কুমার সাহা
অধ্যাপক, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

সকাল থেকেই ক্লাস নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। সময় পাইনি। তাই ইউনিভার্সিটির বোর্ড অফ স্টাডিজ থেকে পাঠানো সার্কুলারটা এখনো দেখা হয়নি। আমাদের বোর্ডের চেয়ারম্যান ফোন করেছিলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রিপোর্টটা পাঠিয়ে দিতে। একনাগাড়ে দু-ঘন্টা প্রোজেক্টরে লেকচার দিতে দিতে চোখ দুটোও ব্যথা করছিল যেন, গলাটাও ধরে আসছিল। তবু চটপট মেলটা খুলে বসলাম। হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল।

বিরক্তই হলাম একটু। কে আবার এই অসময়ে ফোন করল। ফোন তুলেই দেখি তৃণার ফোন। ও তো সাধারণত এসময়ে ফোন করেনা। তাছাড়া আজ ওর ছুটি। ও বাড়িতেই আছে।

আমি ফোন তুললাম।

—হ্যালো।

—আমি তৃণা বলছি।

—বল।

তৃণার গলায় কষ্ট। কী হলো, সকালে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, তখনও তো সব নর্মাল দেখেছি। তাছাড়া তৃণা সাধারণ কোনও কষ্ট হলে ফোন করত না। বিয়ের পর থেকে এত বছর চাকরি জীবনে তৃণা আমাকে চাকরিস্থলে এত কষ্ট উৎকণ্ঠা নিয়ে কখনও ফোন করেছে বলে মনে পড়ে না।

—আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। তুমি এখনই বাড়ি চলে আসো।

তৃণা খুব কষ্টে যেন কথাগুলো বলল।

আমি চমকে উঠলাম। যে তৃণা কিনা হাজার প্রয়োজনেও আমাকে কাজের মাঝে বাড়ি যেতে বলে না। সে কি না আজ ফোন করেই বাড়ি ফিরতে বলছে। সংসার আর ওর কর্মস্থলের কাজ ও দশভূজার মতো একা হাতে সামলায়। কখনো টু-শব্দটি পর্যন্ত করে না। তার গলায় এত কষ্ট, বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য এত তাড়া।

আমি বললাম—কী হল! তোমার যেন খুব কষ্ট হচ্ছে মনে হচ্ছে।

—ভীষণ কষ্ট। বুকের নীচে ওপর পেটে খুব ব্যথা। সহ্য করতে পারছিনা। তুমি যত তাড়াতাড়ি পার, বাড়ি ফিরে এসো।

—সে কি!

আমি কি একটু উতলা হয়ে পড়লাম।

জিজ্ঞেস করলাম—এটা কি গ্যাসের ব্যথা? তোমার তো এমন ব্যথা কোনদিন হয় নি। হঠাৎ কী হল?

—জানি না। খুব কষ্টে যেন কথাগুলো বলল তৃণা।

আমি কি এই সময় একটু অপ্রয়োজনীয় কথা বলে ফেললাম। নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম— ভয় পেয়ো না। আমি এখনই বের হচ্ছি। কিন্তু যত তাড়াতাড়িই যাই না কেন, বাড়ি ফিরতে ঘন্টা দুয়েক লেগে যাবে। এই সময় ফ্ল্যাটে দরজা বন্ধ করে একা থাকা ঠিক নয়। তুমি ফ্ল্যাটের দরজা খুলে রাখো। সঞ্চারীকে ফোন কর। আমার মোবাইলের চার্জ একদম শেষ। আমি জানি না কতক্ষণ ফোনে কথা বলতে পারব। আমি ডঃ সোমক চন্দকে ফোন করছি। কিন্তু একা থেকো না ফ্ল্যাটে। তোমার পাশে কারও থাকার দরকার।

খুব কষ্টে ও বলল—আমি ডঃ চন্দকে ফোন করেছিলাম। উনি বললেন দূরের একটা নার্সিংহোমে উনি আছেন। এত তাড়াতাড়ি উনি আমাকে দেখতে আসতে পারবেন না।

আমি উদ্বিগ্ন হলাম। তবু ডঃ চন্দকে ফোন করে অনুরোধ করলাম, যদি ওঁর পক্ষে একবার আমার বাড়ি গিয়ে মিসেসকে দেখে আসা সম্ভব হয়।

ডঃ চন্দ বললেন—সরি প্রফেসর দাশগুপ্ত, আমার পক্ষে এখন কোনোমতেই তৃণাদেবীকে দেখতে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি দূরে আছি। তবে যদি আপনারা ওকে নিউটাউনের বীক্ষণ নার্সিংহোমে নিয়ে আসতে পারেন, আমি দেখে দিতে পারি। তাছাড়া ওঁর কাছে আমি যা জানতে পারলাম, ওর মনে হয় একটু নার্সিংহোমের পরিচর্যা দরকার।

আমি বললাম—কিন্তু আমি তো রাস্তায়। ফিরতে ফিরতে ঘন্টা দুয়েক লেগে যাবে।

—তবে কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিন। আমি কি অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে দেবো?

—পাঠিয়ে দিন।

আমি চটপট ফোন সেরে সঞ্চারীকে ফোন করলাম। সঞ্চারী আমাদের আবাসনের প্রতিবেশী। আমার খুব স্নেহের। কিন্তু ফোন লাগল না। এদিকে যে কোনো সময় মোবাইল বন্ধ হয়ে যাবে। গাড়িতে বসেই এবার ফোন করলাম পরেশকাকুকে। ভাগ্য ভালো। রিং হচ্ছে। পরেশকাকুর অনেক বয়স। দুপুরের এই সময়ে উনি খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করেন। আবাসনের শুভাকাঙ্ক্ষী পরেশকাকু। তাই ফোন করতে দ্বিধা হচ্ছিল। ভীষণ টেনশন হচ্ছে। পরেশকাকু ফোন ধরলেন।

—হ্যালো।

—কাকু আমি দেবপ্রিয় বলছি। তৃণার হঠাৎ খুব শরীর খারাপ করছে। আমি বাড়ি ফিরছি। রাস্তায়। ওর কাছে কেউ নেই। খুব ছটফট

করছে। যদি কাইন্ডলি সঞ্চারীকে একটু খবর দেন। আমি ওকে ফোনে পাচ্ছি না। আপনার বিল্ডিংয়ের কাউকে দিয়ে যদি খবরটা পাঠাতে পারেন। আমি ডঃ চন্দকে ফোন করেছিলাম। উনি অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

— সেকি কথা। আমি এখনি সঞ্চারীকে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি সাবধানে এসো। তাড়াহুড়ো করো না।

ফোনটা কেটে দিলেন পরেশকাকু।

২

বাড়ি ফিরে দেখলাম তালা দেওয়া ফ্ল্যাটে। ফোন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমি আর কারও সঙ্গে যোগাযোগ করে উঠতে পারিনি।

আবাসনের সামনে পৌঁছতেই সামনের দোকানের ছেলেটা প্রশ্ন করল— কী হল দাদা, বৌদির কি শরীর খারাপ? সঞ্চারীদি আর অমৃতাদি মিলে বৌদিকে নার্সিংহোমে নিয়ে গেলেন।

আমি বললাম— হ্যাঁ।

আমাদের এইটা এখনো আছে। পুরোনো পাড়া কালচারের সঙ্গে নতুন ফ্ল্যাট কালচার। একটা মিশ্রভাব। মিশ্র সংস্কৃতি। এর তার সুবিধা অসুবিধাই পাশে গিয়ে দাঁড়ানো, কখনো পরনিন্দা - পরচর্চা।

আমি তাড়াতাড়ি ছুটে আবাসনের মেনগেটে পৌঁছলাম। আবাসনের উর্দিধারী দারোয়ান ছাড়া আশপাশে আর কাউকে দেখতে পেলাম না। আবাসনের বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই কাজে কর্মে বাইরে। যে ক'জন বয়স্ক - বয়স্কা আছেন, তাঁরা এখনো দুপুরের বিশ্রামে।

আমি ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দৌড়ে ঘরে ঢুকে মোবাইলটা আগে চার্জে বসালাম। তারপর মেডিক্লেম সহ সব প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গুছিয়ে নিলাম। আসার সময় কিছু টাকাও তুলে নিয়েছি এটিএম থেকে। গেট দিয়ে ঢোকার সময় দারোয়ান বলে দিয়েছে, ওরা বীক্ষণ নার্সিংহোমে গিয়েছে। এখন আমাকে দ্রুত নার্সিংহোমে পৌঁছতে হবে।

মুখে চোখে একটু জলের ঝাপটা দিয়ে বোতল তুলে নিয়ে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেয়ে নিলাম। দরজায় পরেশকাকুর গলা পেলাম।

—দেবপ্রিয় ফিরেছ শুনলাম।

পরেশকাকুর হাঁটতে খুব কষ্ট হয়। অস্টিওআর্থাইটিস।

—হ্যাঁ। আমি বললাম, ঘরে আসুন কাকু। বসুন।

—শোন সঞ্চারী আর অমৃতা তৃণাকে নিয়ে নিউটাউনের বীক্ষণে নিয়ে গিয়েছে। ডঃ চন্দর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ডঃ চন্দ যত তাড়াতাড়ি নার্সিংহোমে চলে যাচ্ছেন। শোন, তুমি একটু কিছু মুখে দিয়ে যাও। কোথায় কী খাবারের দোকান পাবে ঠিক নেই।

পরেশকাকু এইরকমই। বলা যায় আমাদের আবাসনের লোকজনের মধ্যে একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক আছে। পরেশকাকুর বয়স আশি পেরিয়েছে। একসময়ের ডাকসাইটে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ছিলেন। এখনো অসম্ভব মনের জোর। দুই মেয়েই আমেরিকায়। কাকিমা অসুস্থ। তবু দুএক বছর পর পর মেয়েদের কাছে বেড়াতে যান। এখনো রিক্সা করে বাজারে যান। রিক্সাওয়ালা ওঁর বাজারটা ফ্ল্যাট অবধি পৌঁছে দেয়। গাড়ি - ড্রাইভারের ঝামেলা চুকিয়ে পরেশকাকু এখন রিক্সা নিয়েই সর্বত্র ঘোরাফেরা করেন। রিক্সা ওঁর নিত্যসঙ্গী। আমাদের আবাসনটা কেমন এই ক'বছরের মধ্যেই বৃদ্ধদের আবাসন হয়ে গেল। কলকাতা এখন উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত মানুষের বৃদ্ধাবাস হয়ে উঠছে।

৩

নার্সিংহোমে পৌঁছে দেখলাম সঞ্চারী দাঁড়িয়ে আছে গেটের সামনে। আমাকে দেখেই এগিয়ে এল—দাদা, তৃণাদিকে ভর্তি করে নিয়েছেন। ডঃ চন্দ এসে গিয়েছেন। ইমার্জেন্সিতে আনার পরই ডঃ সমীরণ রক্ষিত বললেন, মনে হচ্ছে ভর্তি করে নিতে হবে। তৃণাদি যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন। ইসিজি করা হয়েছে ডঃ রক্ষিত বললেন, রিপোর্ট নর্মাল। কিন্তু সুগার লেবেল হঠাৎ বেড়ে গিয়েছে। বলছেন গতকাল থেকে নাকি ইউরিন হলুদ হচ্ছিল খুব। তৃণাদি ভেবেছিল, ভিটামিন খাচ্ছে, তাই। ডাক্তার বলছেন জন্ডিসের লক্ষণ খুব স্পষ্ট। ব্লাড নিয়ে টেস্ট করতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আগে তো সুগার ছিল না। হঠাৎ করে সুগার বাড়া, জন্ডিস আর ব্যাথার ধরণ দেখে ডাক্তাররা মনে করছেন গলব্লাডারে স্টোন হতে পারে। আবার অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস বা অ্যাকুউট প্যানক্রিয়াটাইটিস হতে পারে। ওঁরা তৃণাদিকে স্যালাইন দেওয়া শুরু করে দিয়েছেন। এক নিঃশ্বাসে সঞ্চারি এতগুলো কথা বলে যেন হাঁফাচ্ছিল। অমৃতা তৃণার কেবিনে ওর পাশে দাঁড়িয়ে। আমি ত্রস্তপদে নার্সিংহোমের দোতালার দিকে পা বাড়ালাম। আমার পিছনে সঞ্চারী।

সিঁড়ির মুখেই ডঃ চন্দের সঙ্গে দেখা। উনি সঞ্চারীর কথাগুলোই আর একবার বললেন। শুধু বললেন রাতে ব্লাড রিপোর্ট এলে এবং আগামীকাল সকাল সাতটায় আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করলে বোঝা যাবে কী হয়েছে। তখন ডায়াগোনিসিস হলে আমরা নেক্সট স্টেপ নিয়ে ভাবব।

আমি বললাম—ডাঃ চন্দ আপনি ওর বেস্ট ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করুন। প্রয়োজন হলে আপনি অন্য স্পেশালাইজড্ ডক্টর কল করতে পারেন।

ডঃ চন্দ বললেন — আমি অলরেডি গ্যাস্ট্রোএনটোলজিস্ট ডঃ তাপস সমাদ্দারকে কল করেছি। উনি আসছেন।

ভাবছিলাম বীক্ষণ নার্সিংহোমটা সবে শুরু হয়েছে। তেমন বড়ো নয়। ব্যবস্থা এখনো তেমন সর্বাধুনিক নয়। এখানে রাখাটা কি ঠিক হচ্ছে? কিন্তু এই মুহূর্তে তো আর কিছু করার নেই। ডঃ চন্দ হাউজ ফিজিসিয়ান। সময়ে অসময়ে উনি বাড়ি চলে আসেন। সব কথা ধৈর্য ধরে শোনেন। পরামর্শ দেন। সুতরাং আজকের রাতটা দেখা যাক। ছেলে তো বলছে, বাবা, মা'র ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে কোনও কম্প্রোমাইজ

করো না। ঋজুরেখ মা অন্ত প্রাণ। গতকালই ছেলেকে মাঝরাতে রাজধানীতে তুলে দিয়ে এসেছি আমি আর তৃণা। কোনো অসুবিধার কথা কিছু বলেনি। খ্রিস্টমাসের ছুটিতে ঋজু দিল্লি থেকে বাড়ি এসেছিল। জেএনইউতে পড়ছে, কিন্ত এখনো বারবার ফোন করে মা-র সাথে কথা না বললে ওর চলে না। তৃণা বিকেলে নার্সিংহোমে ভর্তি হওয়ার পর পরই ও ফোন করেছিল। তৃণা তখন ছটফট করছিল। ও কথা বলতে পারেনি। আমি ফোন ধরেছিলাম। তৃণার কথাটা ছেলেকে এখনি বলা হবে কিনা তাই ভাবছিলাম। মা কেন কথা বলছে না, কোথায় ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে আমাকে বলতেই হল সব।

শুনে ঋজু যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলল, দুপুরেও মা- র সাথে কথা হয়েছে। তখনও তো নর্মাল ছিল।

বুঝলাম ও খুব উতলা হয়ে পড়েছে। ছেলেটার মুখটা চোখের উপর ভেসে উঠল। বেচারা। সামনে পরীক্ষা। তাই তাড়াতাড়ি চলে গেল। এখন ওর উপর ভীষণ চাপ বেড়ে গেল। ঋজু গলা স্বাভাবিক রেখে বলল, বাবা, তুমি মাথা ঠান্ডা রেখে ডিসিশন নাও। কোনো কম্প্রোমাইজ করো না। প্রয়োজন হলে এখনি মা-কে নামী নার্সিংহোমে শিফট করো।

আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল।

৪

মাঝরাতে থাকতে না পেরে ডঃ চন্দকে ফোন করলাম। ডঃ চন্দ ফোন তুলেই বললেন—ভালোই হল আপনি ফোন করেছেন। আপনার মিসেসের ব্যাপারটা একটু জটিল হয়ে গিয়েছে। একটু আগেই ব্লাড রিপোর্টটা পেয়েছি আমরা। বিলিরুবিন ভীষণ হাই। লাইপেজ - অ্যামাইলেজ রিপোর্টও খুব খুব বেশি। মনে হচ্ছে এটা অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস এবং অ্যাকুউট প্যাঙ্ক্রিয়াটাইটিস। ডঃ সমাদ্দার এসে মিসেস দাশগুপ্তকে দেখে গিয়েছেন। আমরা ওষুধ শুরু করে দিয়েছি। কাল সকালে আলট্রাসোনোগ্রাফি করা হবে। তবে আমার মনে হচ্ছে ওঁকে এএমআরআই- তে শিফট করতে হবে। আপনি সকাল আটটার মধ্যে বীক্ষণে চলে আসুন।

আমি বললাম — ওর ব্যথাটা কি এখন কমেছে?

—হ্যাঁ, উনি ঘুমুচ্ছেন।

ডঃ চন্দ ফোনটা রেখে দেওয়ার পরও আমি ফোনটা ধরেইছিলাম।

ঋজু বলেছিল, একটা রাতও মা- র কাছে ইম্পরটেন্ট। তাই একটা রাতও কি সব সুযোগ সুবিধাহীন জায়গায় মাকে রাখা হচ্ছে।

ডঃ চন্দকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

উনি বলেছিলেন অত ভাবার কিছু নেই। কাল ভাবা যাবে। দরকার হলে আমি আপনাকে ডঃ শুভব্রত চৌধুরীর কাছে রেফার করে দেবো। আগে ব্লাড রিপোর্ট আর ইউএসজি রিপোর্টটা আসুক।

ডঃ চন্দ কিন্তু রাতেই বলে দিলেন সকালে তৃণাকে এএমআরআই-তে শিফট করা হবে।

সারারাত ঘুম হল না। কত চিন্তা ভিড় করছিল মনে। ঋজু এর মধ্যেই তিন চারবার ফোন করেছে। বাবা তুমি স্টেডি থাকো। আমি সামনের সপ্তাহে পরীক্ষা শেষ করে ঐদিনের ফ্লাইটেই বাড়ি ফিরে আসব।

ভাবছিলাম, সেদিনের বাচ্চা ছেলেটা বড়ো হয়ে গেল, বাবাকে সাহস জোগাচ্ছে। অথচ এখনো তেমন করে গোঁফের রেখা চওড়া হল না।

৫

আই সি ইউ ওয়ার্ডের সামনে আমি বসে। আমার উল্টোদিকের সোফাতে আর একজন ভদ্রমহিলা বসে। ওঁর চোখ দিয়ে অনবরত জল ঝরছে। আর বারবার টিসুপেপার দিয়ে উনি চোখের জল মুছছেন। এত বড়ো হাসপাতাল হলে কি হবে, কোথাও একটু জায়গা নেই। এত অল্প জায়গায় মুখোমুখি দুটি সোফা। না চাইলেও চোখে চোখ পড়ে যায়। ভদ্রমহিলা বেশ বয়স্কা। বনেদী ঘরের, দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সারা শরীর বোরখায় ঢাকা। খুবই ফর্সা এবং সুন্দরী। অথচ মুখটা যেন মাতৃ অবয়বের প্রতিমূর্তি।

এখানে সাধারণত কাউকে বসতে দেওয়া হয় না। কিন্তু আজই যেহেতু আমার পেশেন্ট ভর্তি হয়েছে, তাই আমাকে এই পাঁচতলায় বসতে দেওয়া হয়েছে। ডঃ চন্দ আগেই ফোন করে দিয়েছিলেন ডঃ চৌধুরীকে। ডঃ চৌধুরীর সঙ্গে ওঁর পরিচয় আছে আগে থেকেই, আমাকে বলেছেন। বলেছেন, চিন্তা নেই। উনি খুবই ভালো ডাক্তার। আমি এখানে রেখেই মিসেস দাশগুপ্তের ট্রিটমেন্ট করতে পারতাম। কিন্তু এখানে এমআরসিপি- ইআরসিপির ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া উনি প্রতিদিন এতো ইআরসিপি করেন, যে, ওর কাছে যাওয়া মানে প্রায় নিশ্চিন্ত হওয়া।

সকালে বীক্ষণে যেতেই ডঃ চন্দ বলেছিলেন যে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি রিপোর্টে দেখা গেছে মিসেস দাশগুপ্তের গলব্লাডারে স্টোন, কিন্তু কিছু স্টোন বেরিয়ে এসে বাইলডাক্টে আটকে গিয়ে বিলিরুবিন অসম্ভব বাড়িয়ে দিয়েছে। লিভার ও প্যানক্রিয়াস এফেক্ট করছে। তাই ওকে আমরা রেফার করছি ডঃ চৌধুরীর কাছে বড়ো হাসপাতালে।

এএমআরআই-তে ভর্তির এতসব ফর্ম্যালিটি মিটিয়ে ইমারজেন্সিতে শুনলাম ওকে আইসিইউ এর এইচ ডি ইউতে ভর্তি করা হয়েছে। ডঃ চৌধুরী ভীষণ ব্যস্ত, একটু বাদে উনি ওয়ার্ডে গিয়ে দেখে আসবেন। আমাকে ওয়ার্ডের সামনে বসতে বলা হল। ডঃ চৌধুরী দেখার পর ওর সঙ্গে কথা বলতে বলা হল। তাই আমি একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে আইসিইউ ওয়ার্ডের বাইরে অপেক্ষা করছি। মুশকিল হল আমি ডঃ চৌধুরীকে চিনি না। তাই ওয়ার্ডের বাইরের সিকিউরিটি মহিলাকে বললাম, ডঃ চৌধুরী এলে আমাকে চিনিয়ে দেবেন।

আমি আর সাতপাঁচ কিছুই ভাবতে পারছিলাম না। সেন্ট্রালি এয়ার কন্ডিশনড্ বিল্ডিংয়ের সব জানালা কাচ দিয়ে বন্ধ। আমি সেই জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে। আমার সঙ্গে আবাসনের দুজন এসেছেন।

তাঁরা নীচে বসে আছেন। ভদ্রমহিলাও আড়চোখে আমাকে দেখছেন। কিন্তু চোখে জলের ধারা যেন কিছুতেই থামছে না। বারবার টিস্যুপেপার ভিজে যাচ্ছে।

এভাবে কতক্ষণ কেটে গিয়েছে আমি জানি না।

হঠৎ সিকিউরিটি ভদ্রমহিলা একজনকে বললেন, স্যার নতুন পেশেন্ট যাকে আপনি দেখলেন তার বাড়ির লোক আপনার সঙ্গে কথা বলবেন বলে অপেক্ষা করছেন।

আমি এমন কথায় সিকিউরিটির দিকে তাকালাম।

উনি বললেন— স্যারের সঙ্গে কথা বলুন।

আমি দেখলাম একজন সৌম্যকান্তি ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

বললেন— হ্যাঁ, আমি ওকে দেখলাম। কাল এমআরসিপি-র পর বুঝতে পারব, কী অবস্থা। চিন্তার ব্যাপার তো আছেই।

এই বলে ডঃ চৌধুরী লিফটের দিকে হাঁটা দিলেন।

আমি ধপ করে মাথা নীচু করে বসে পড়লাম।

কতক্ষণ এমন করে বসেছিলাম জানি না। হঠাৎ সামনের ভদ্রমহিলার কণ্ঠ পেলাম—আল্লা মেহেরবান। ইনশান কো কোই তকলিফ নেহি দেঙ্গে।

আমি মুখ তুললাম। ওঁর দিকে তাকিয়ে। আবার বলতে শুরু করলেন,—হামকো মালুম নেহি আপ হিন্দু আওর মুসলমান। আল্লা তো আল্লাই হোতা হ্যায়। উনো নে সব কো ভালাই চাতা হ্যায়। উনকো পাস সব বান্দা একই হ্যায়। মইনে তো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কি বাদ একই দোয়া মাঙি—আল্লা তুম্ হি সব কো রাখনেওয়ালে। সব কো খুশ রাখিয়ে। আপকো বান্দাকো খুশ রাখিয়ে। তবিয়ত আচ্ছা রাখিয়ে। আপ চিন্তা মাত কি জিয়ে। ম্যায় নে মেরি বেটি কে লিয়ে যব দোয়া মাঙেঙ্গে, আপকো বিবি কে লিয়ে ভি দোয়া মাঙেঙ্গে। হর মরীজ কে লিয়ে, হর ইনশান কে লিয়ে —।

ভদ্রমহিলা আবার চোখ মুছলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—আপ কি বেটি কি কিয়া হুয়া মাইজি।

—দিল কি বিমারি।

—দিল কি বিমারি!

—জী, লেকিন মেরা বিশওয়াস হ্যায়, উনকো কুছ নেহি হোগি। ম্যায় উনকি আম্মিজান, খুদা মেহেরবান। আল্লা মেরি উমর মেরি বেটি কি সাথ লাগা দিজিয়ে। আপ কি বিবি কা সাথ লাগা দিজিয়ে, হর মরীজ কি সাথ লাগা দিজিয়ে।

৬

পরদিন তৃণার ইআরসিপি হয়ে গেল। তার আগে সকাল থেকে কতকিছু টেস্ট হল। এমআরসিপি হল। ইআরসিপি করার আগে ডঃ চৌধুরি অনেক কথা বললেন। ওঁর টেবিলের উল্টোদিকে বসিয়ে এমআরসিপি-র প্লেট দেখিয়ে বোঝাচ্ছিলেন, এই দেখুন, এখানে বাইল ডাক্টে স্টোনগুলো আটকে আছে। ব্লকড। মেটাবলিজম তাই এলোমলো হয়ে গিয়েছে। আমি এইখান দিয়ে এন্ডোস্কোপিক ক্যামেরা ঢুকিয়ে দেখে একটু লেসার দিয়ে মুখটা বড় করে স্টোনগুলো বের করে এনে ইনটেসটাইনের মধ্যে ফেলে দেব। তারপর ওগুলো আপনা আপনি ডাইজেস্টিভ ওয়েষ্টের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু আমাকে এটাও বলে রাখতে হবে, এতে রিস্ক আছে। আপনারা বন্ড সই করে দিন। আমরা ওকে অপারেশন থিয়েটারে ঢোকাব। ফুল অ্যানাসথেসিয়া করে এটা করা হবে।

আমি বললাম— ডঃ চৌধুরী, আপনি এত এক্সপেরিয়েন্স। প্রতিদিন এতজনের এমন চিকিৎসা করছেন। আপনার হাতে আমি ওকে দিয়ে নিশ্চিন্তবোধ করছি।

ডঃ চৌধুরি বললেন—কিন্তু আমি তো ভগবান নই। সম্ভাবনার সব দিক আপনাকে আমার বলতেই হবে।

আমি তখন খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম—আপনি ভগবান নন ঠিকই, কিন্তু এই দুর্বলতম মুহূর্তে আপনি আমার কাছে নেক্সট টু গড।

ডঃ চৌধুরি একটু হেসে ভেতরে ঢুকে গেলেন। তৃণা তারই মধ্যে বলল, কিন্তু ডাক্তারবাবু কারও উপর তো আস্থা রাখতেই হবে। আমি আপনার উপরই আস্থা রাখছি।

যখন আমি এবং তৃণা ফর্মে সই করছি, তখন তৃণা কোনও দেবদেবীকে স্মরণ করে কপালে হাত ছোঁয়াল।

আমিও অজানা ঈশ্বরকে প্রণাম জানালাম মনে মনে। হঠাৎ আমার মনে পড়ল সেই বোরখা পড়া মহিলার কথা; কোই তোকলিফ নেহি হোগা। আল্লা মেহেরবান, সব কো ভালাই হোগা। আল্লা পর ভরসা রাখিয়ে। হাম আপকো বিবি কি লিয়ে ভি খুদা কি পাশ দোয়া মাঙেঙ্গে।

বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা বল পেলাম। সাহস!

৭

কদিন কেটে গেল। তৃণাকে এখন জেনারাল ওয়ার্ডে দিয়েছে। এ কদিনে ওর বিলিরুবিন অনেকটাই কমে এসেছে। তবে সব মেটাবলিজম নর্মাল হয়নি। আর একটু নর্মাল হলে তৃণার অপারেশন হবে। কিন্তু ও খুব দুর্বল। রোগাও হয়ে গিয়েছে অনেক। ওজন কমেছে বেশ। তবু ডঃ চৌধুরি অপারেশন না করে তৃণাকে বাড়ি পাঠাবেন না। কারণ স্টোন আবার বেরিয়ে এলে সেটা খুব খারাপ হবে। সার্জেন ডঃ ইন্দ্রাশীষ গুপ্ত তৃণার অপারেশন করবেন। ডঃ গুপ্ত এফআরসিএস ডাক্তার। উনি তৃণার প্রতিদিনের খবর রাখছেন।

সেদিন লিফটে উঠছি। হঠাৎ সেই ভদ্রমহিলাকে দেখলাম ছুটতে ছুটতে আসছেন। আমি হাত তুলে লিফটের দরজা আটকালাম। ভদ্রমহিলা ভেতরে ঢুকতেই লিফট ছেড়ে দিল।

আমি ডাকলাম—আম্মিজান।

ভদ্রমহিলা একটু চমকালেন মনে হল যেন।

জিজ্ঞেস করলাম—আপ কা বেটি কি তবিয়ৎ?

ভদ্রমহিলা কি এই কদিনে একটু ক্লিশে হয়ে গিয়েছেন। একটু রোগা।

—আভি তো বহুৎ টেস্ট জারি হ্যায়।

ভিজিটিং আওয়ার। তাই অনেক লোকের ভিড় হাসপাতালে। আমি ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকালাম।

—আপ কি বিবি কোন সি ওয়ার্ড মে ?

ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন।

—জেনারাল ওয়ার্ড।

—চলিয়ে, থোরি দেখ সাকতি।

—জরুর চলিয়ে।

দুজনে তৃণার বেডের পাশে এসে দাঁড়ালাম ।

ভদ্রমহিলা বললেন— বেটি, সব ঠিক হো জায়েগা। ঘাবরাও মাত।

তৃণা হাসল।

ভদ্রমহিলা ওঁর ব্যাগ থেকে কিছু একটা বের করলেন। হঠাৎ ওকে স্পর্শ করলেন মাথায়।

বললেন— পীর কা দরগা কি মিট্টি। সব ঠিক হো জায়েগা।

৮

তৃণার অপারেশন হয়ে গিয়েছে। ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরেছে। অনেক যত্নে ওকে রাখার চেষ্টা করছি। ছেলে অপারেশনের পরের দিনের ফ্লাইটে পরীক্ষা শেষ করেই বাড়ি ফিরেছে। আজ পাঁচদিন পর তৃণার চেকআপ ডেট।

তৃণার প্রোগ্রেস ভাল। ডঃ গুপ্ত কিছু ওষুধ লিখে দিলেন। সাবধানে কিছুদিন থাকতে হবে ম্যাডাম।

একটু হালকা মনে হাসপাতাল থেকে ধীরে ধীরে বের হচ্ছি। বেশ ভিড় চারদিকে।

হঠাৎ সেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা। এ কদিন আমি যেন আনমনেই ওঁকে খুঁজেছি। খুব ইচ্ছে করেছে ওঁর মেয়ের খোঁজ নিতে। কিন্তু দেখা হয়নি এত বড়ো হাসপাতালে। হঠাৎ ওঁকে দেখে যেন একটু উজ্জল হয়ে উঠল আমার মুখ।

আমি দ্রুতপায়ে একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম—আম্মিজান।

ভদ্রমহিলা আচমকা আমাকে দেখে চমকে উঠলেন যেন।

—আম্মিজান, আপ কি বেটি কি কিয়া খবর হ্যায়?

—আজ তো ছুট্টি হো গয়া।

—ইয়ে তো খুশি কা বাত।

—জরুর।

ভদ্রমহিলা আর চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন—আপ কা বিবি!

—আজ চেক আপ কা ডেট থা।

ততক্ষণে তৃণা আস্তে আস্তে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে।

—তৃণা ওকে ঝুঁকে প্রণাম করতে এগিয়ে যেতেই ভদ্রমহিলা ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

—নেহি নেহি বেটি। অপারেশন কা বাদ মাত ঝুকো বেটি।

ভদ্রমহিলা অনেক রোগা হয়ে গিয়েছেন। মুখ দেখেও বোঝা যাচ্ছিল ওঁর শরীরের উপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গিয়েছে। ওর যেন এ কদিনে বয়স বেড়ে গিয়েছে অনেক।

—আপ কা বেটি কাঁহা? আমি জিজ্ঞস করলাম।

—আরাহা হ্যায়।

পিছনে তাকিয়ে দেখলাম ওয়ার্ডবয় হুইল চেয়ার ঠেলে একজন মহিলাকে ভদ্রমহিলার সামনে এনে দাঁড় করালো।

—মেরি বেটি।

তৃণা ওকে দেখে হাসলো।

মেয়েটিও হাসলো। শুকনো হাসি। এতসব টেষ্ট আর স্যালাইন ওষুধে শরীর জর্জরিত বোঝা যাচ্ছে।

—আভি কায়সে হ্যায় আপ।

—ঠিক হ্যায়। কষ্ট হচ্ছিল যেন।

তৃণা হঠাৎ ওর ছোট্ট পার্সটা বের করে তার থেকে একটা কাগজে মোড়ানো শুকনো ফুল বের করে মহিলার মাথায় স্পর্শ করল। চোখ বন্ধ করে অস্ফুটে কিছু বিড়বিড় করল। ওর পার্সে সবসময় ঠাকুরের ফুল থাকে। আমার বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ও তৃণা ওর ঠাকুরের ফুল স্পর্শ করে। ও এ ব্যাপারে কেমন যেন এক সংস্কারে আবদ্ধ। প্রিয়জনের মঙ্গলকামনায় এটা ওর সংস্কার।

বলল—মাইজি, ও খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে।

হঠাৎ নজরে পড়ল, আম্মিজানের চোখ দুটো চিকচিক করছে।

আমার চোখও ছলছল করে উঠল।

আমি বললাম—আম্মিজান, আপ কি আঁখ পর আঁশু?

—ইয়ে তো খুশি কি আঁশু বেটা। সুখ - দুখ্ কা আঁশু কা কি কই রঙ হোতা হ্যায়।

আমি ওঁর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখলাম। টিস্যু পেপার দিয়ে উনি চোখ মুছলেন। আমার বুকটা ভারী হল। মনে মনে বললাম, ঠিকই তো সব মায়ের অশ্রুর রঙ একই। সেখানে হিন্দু - মুসলমান মায়ের কোনও ভেদ নেই।

তাকিয়ে দেখলাম ওয়ার্ডবয় মেয়েটির হুইলচেয়ার ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওর পিছন পিছন এগিয়ে ওর পরিবারের লোকজন।

আমি তৃণার হাত ধরলাম শক্ত করে। বললাম—চলো বাড়ি ফিরতে হবে।

মৌপ্রিয়া মণ্ডল

দ্বিতীয় সেমেস্টার, রসায়ন বিভাগ

মৌপ্রিয়া মণ্ডল

দ্বিতীয় সেমেস্টার, রসায়ন বিভাগ

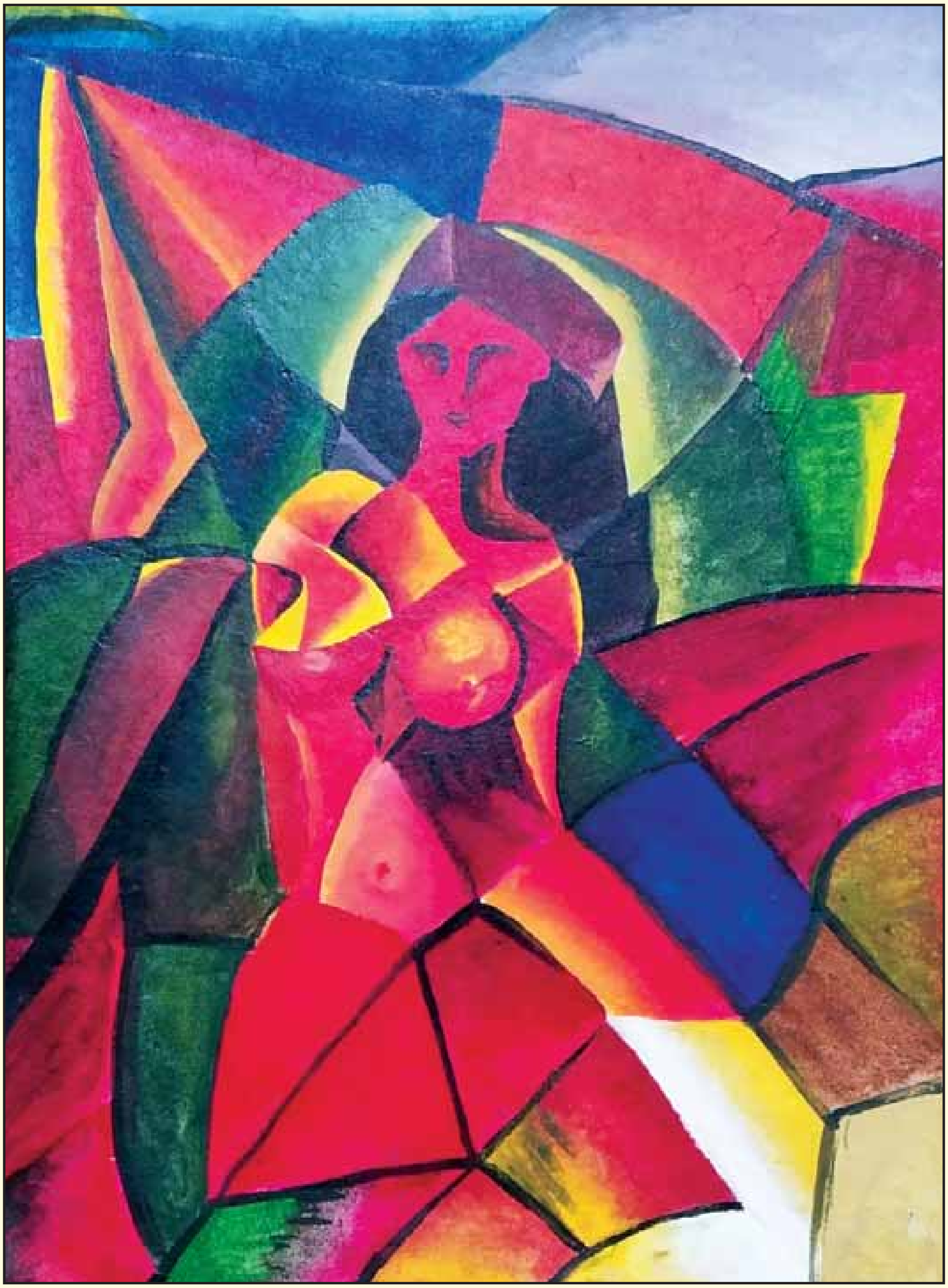

সনম মণ্ডল
দ্বিতীয় সেমেস্টার, ইংরেজি বিভাগ

She is!
In search of liberty

Subarna Chongder
Second Semester, English Hons.

There was a time when women's rights were infringed. There was no liberty to take decisions on their own individually.

I am going to give an account of a girl, who lived in that type of puritan society.

Now she is eighteen, whenever she wants freedom, she finds herself to be restrained, she comes to understand that, she is being tethered by several types of knots, which are created by patriarchal society, such as, she has to return to her home from the outside within 9 p.m., as a girl she has to be always polite and sober in front of others, if there's any transgression going on she cannot raise her voice because it shows that the girl is rebellious. If she loves somebody, she has a flaw in her own character because polite girls or the girls from conservative families never fall in love. She wants to learn Kathak but again the same fear comes before her passion. There comes a day, 15th of August. She goes upstairs toward the terrace and takes her favourite kite. Meanwhile her grand mother comes and says that she cannot fly kites just because it does not suit a girl's image. Again she falls. If a girl has some male friends, then again the girl is considered a philanderer. When she is at her home with no work, she tries to control herself to be a quiet person but no one notices that, she never goes outside her house from the fear that if she does anything wrong, society will debase her. When she returns from the college, she hears a noise which tells that women look better always in the kitchen cooking for the family, not holding books in the hands and some higher degree before their name. Though, she has the high prospect to establish herself as an educated and well established woman. The puritan society and their supremacy repeatedly deters her from growing up into a prosperous lady.

Frequently she tries to look over and over around a cage which is claustrophobic, empty. She wants to be as free as a white dove she released from the cage some days before. She wants to fly, release all human beings, and other creatures from confinement, as she is now.

She can do nothing but she presumes that some day the society will be without prejudice. She continues to hope that she will win over these hindrances. And now she is eighteen.

"

The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others.

– Mahatma Gandhi

Apocalypse and After: Balancing the Virtual and the Real

Dr. Kuntal Chattopadhyay
Associate Professor, Department of English

The word 'apocalypse' lexically refers to "the complete final destruction of the world, as described in the biblical book of Revelation". By way of generalization, therefore, it means "an event involving destruction or damage on a catastrophic scale". 'Apocalypse' is a Greek word meaning "revelation", and Wikipedia defines it as "an unveiling or unfolding of things not previously known and which could not be known apart from the unveiling".

For the last few months, all over the world, we are in a process of one such "unveiling or unfolding" of a catastrophic situation "not previously known" to us. Our anxious eyes are daily fixed on the Covid Tracker as we see the Corona curve in our country mounting and mounting, seemingly approaching the peak, and yet still not reaching it. Once the summit is reached, there might be a downward slide to the base level. But where is the hilltop and how far is the hilltop?

After being confined to an unprecedented lock-down condition for a considerable length of time, we are now stepping into the processes of staggered unlocking, counting huge losses already suffered and apprehending many more to come. As we move through "an unveiling or unfolding of things not previously known", many literary and philosophical texts and narratives come and go in the room of our heads talking in the tune of Corona virtuoso. The invisible virus has forced all of us to a condition of compulsive self-isolation, home-quarantine and social distancing, a condition which is mandated, repetitive, depressive and increasingly obsessional.

This is precisely at this point that Albert Camus' philosophical classic, *The Myth of Sisyphus* (originally published in French in 1942) may return to our minds as a new testament of human existentiality. We are familiar with the story that Camus re-invested with a philosophical discourse. Zeus, the King of the Olympian gods, punished Sisyphus, a mythic figure of ancient Greece, by having him roll a heavy stone up a large hill for eternity. Every time Sisyphus got the rock to the top of the hill, it would roll back to the bottom, at which point Sisyphus would roll the rock back to the top, only to see it fall back down again, *ad infinitum*. Camus wanted to address a number of philosophical / existential questions, for example, if life is worth-living, if it is all absurd, if it can be made meaningful, or how to appraise our lives. The story of Sisyphus as philosophized by Camus is the narrative of an existentially mandated human condition which can only be pursued and pursued, a game as it were which can neither be finished, nor abandoned.

All of a sudden, all of us are seemingly trapped in a similar fatality in our encounter with the seemingly omnipotent virus, may be a sort of cruel god bent on punishing us. We are all like Sisyphus repeating the same action every day. We can realize our helplessness. After having disinfected all my home surfaces—the floors, the table-tops, the key-board and the mouse, the hand-set, the refrigerator, the kitchen-sink et al—with a bottle of disinfectant, I come to realize that the plastic bottle itself was not disinfected. So far we were told to maintain 'social distancing' to the extent of one meter since the virus is presumed to be rather large and heavy and transmits only via droplets. But now we find ourselves more helpless as we come to know that the virus is really not so heavy and it can float in air for some sixteen feet or so. We need more distance between oneself and another, and may be, no known specific distance is ever fully safe for us.

We have learned many words anew, a whole host of terms and phrases that indicate the Sisyphus-like absurdity in the real—quarantine, isolation, lock-down, hotspot, buffer, co-morbidity etc. Sisyphus's life was painfully repetitive, a destiny of a mission never to be achieved, but never to be left either. His life was futile and pointless. But Sisyphus was compelled to roll the stone. Zeus had given him no other choice. Unlike Sisyphus's large stone, corona virus is very small, and yet our mission against it is precisely a Sisyphean task. We also have no choice but to try to push corona virus away, doing so over and over again, indefinitely living

in the apprehension that it will come back. Corona virus is a plague (remembering Camus' novel) not merely on human happiness, which is popularly expected to be ensured with health and wealth, but it is also a plague on the philosophical question of meaning in human lives vis-à-vis the meaning and value of all planetary lives. It is like Prufrock's overwhelming question in T.S. Eliot's famous poem, which is, how to deal with a loss of meaningfulness—"Do I dare / Disturb the universe?" We are, like Prufrock, afraid of death on all sides, and carrying the *Aarogyasetu App* in our mobile phone, everyone of us may be muttering Prufrock's words : "I have seen the eternal Footman hold my coat, and snicker, / And in short, I was afraid."

In today's carefully distanced state of quarantine and masked isolation triggered by the fear of the lethal Covid 19, nothing could be as revealing as what Colson Whitehead wrote years ago in *Zone One* (2011) in the form of a commentary on a dystopic end and beyond: "Best to let the broken glass be broken glass, let it splinter into smaller pieces and dust and scatter. Let the cracks between things widen until they are no longer cracks but the new places for things. That was where they were now. The world wasn't ending: it had ended and now they were in the new place. They could not recognize it because they had never seen it before." *Zone One* tells the story of a virus-induced pandemic that has devastated the planet dividing humanity into two types: the uninfected and the infected, the living and the living dead. After the worst of the plague is over, armed forces stationed in Chinatown's Fort Wonton have successfully reclaimed the island south of Canal Street—aka Zone One. At once a chilling horror story and a literary novel by a contemporary master, *Zone One* is a dazzling portrait of modern civilization in all its wretched, shambling glory.

Living all by myself, 'living and partly living' like the Canterbury charwomen in another Eliot masterpiece, *Murder in the Cathedral*, and thinking somewhat obsessively in the face of the ever-rising Corona curve, I just try to envision the apocalypse ahead and beyond, recollecting some more lines from another work of fiction, Emily St. John Mandel's novel, *Station Eleven* (2014): "No more Internet. No more social media, no more scrolling through litanies of dreams and nervous hopes and photographs of lunches, cries for help and expressions of contentment and relationship-status updates with heart icons whole or broken, plans to meet up later, pleas, complaints, desires, pictures of babies dressed as bears or peppers for Halloween. No more reading and commenting on the lives of others, and in so doing, feeling slightly less alone in the room. No more avatars." Much of Mandel's superbly layered novel is set in the wake of a devastating swine flu pandemic, which kills 99 percent of humanity. It conveys at once a real sense of loss at the fall of civilization as well as a wonderful take on the new life after the fall. The book's structure juxtaposes scenes of survivors of the epidemic with the sudden end of the world. We find characters holed up in tower blocks while the world collapses around them, as well as the unlucky survivors who walk blasted roads in search of vestiges of civilization. But whereas most apocalypse novels push grimly forward into the horrific or dystopic, *Station Eleven* skips back and forth between the pre-pandemic world and Year Twenty after global collapse, when the worst is over and survivors have banded together into isolated settlements. Gradually, the book builds cumulative power as connections are made between the two time frames, and characters that do or don't survive.

Now allow me a cinematic jump cut to take you in a flashback to our very own Saratchandra Chattopadhyay, *Srikanta (part 2)* to be more precise: "পরদিন বেলা এগার-বারটার মধ্যে জাহাজ রেঙ্গুন পৌঁছিবে; কিন্তু ভোর না হইতেই সমস্ত লোকের মুখচোখে একটা ভয় ও চাঞ্চল্যের চিহ্ন দেখা দিল। চারিদিক হইতে একটা অস্ফুট শব্দ কানে আসিতে লাগিল, কেরেন্টিন। খবর লইয়া জানিলাম, কথাটা quarantine: তখন প্লেগের ভয়ে বর্মা গভর্নমেন্ট অত্যন্ত সাবধান। শহর হইতে আট-দশ মাইল দূরে একটা চড়ায় কাঁটাতারের বেড়া দিয়া খানিকটা স্থান ঘিরিয়া লইয়া অনেকগুলি কুঁড়েঘর তৈয়ারি করা হইয়াছে; ইহারই মধ্যে সমস্ত ডেকের যাত্রীদের নির্বিচারে নামাইয়া দেওয়া হয়। দশদিন বাস করার পর, তবে ইহারা শহরে প্রবেশ করিতে পায়।" This description captures the moment of Srikanta's arrival at plague-ridden Burma when it was a British colony. Perhaps Bengali readers came across the now globally popular word 'quarantine' here in this passage for the first time. A close look at the details in the quoted passage shall give you an idea of the similarity of health protocol during the current pandemic as the apocalypse is being revisited. That was an epidemic of the colonial period, dimensionally different from this post-colonial as well as trans-colonial pandemic, although the basic truth remains unaltered that be it epidemic or pandemic, it exposes the endemic.

We are familiar with one of famous Shakespeare quotes from *Hamlet*, "something is rotten in the state of Denmark". It was spoken idiomatically to suggest that something was not right in the state. But Hamlet and others somehow got the smell of it. Fortunately, they

were not intellectually Covid positive. Now we know that one of the symptoms of Corona infection is the loss of the sense of smell. That is to say, Covid pandemic takes away from us the olfactory sensation and so we cannot even smell the rot. This loss of one sensation in the state of an unfolding apocalypse may be taken as real as well as symbolic, and this reminds me of the symbolism of the loss of eyesight in a famous novel, called Blindness (1995), by the Nobel-winning Portuguese author, Jose Saramago. The novel allegorizes the dystopian outcome of a plague of white blindness, a mysterious disease that is eventually known as the "white evil." Someone suddenly turns blind while standing in the road near a traffic light. The doctor who treats the blind also turns blind and then the blindness spreads. To arrest future contamination, the government arranges for quarantine in an abandoned mental asylum. Inside the asylum, the reader is provided with the harrowing account of a small group of internees led by the Doctor's Wife, who is the only person to retain her eyesight. The white blindness spreads exponentially and as the number of quarantined individuals keeps mounting, social order crumbles and morality disintegrates. However, there still remain those individuals who make decisions that demonstrate altruistic sacrifice for the good of the rest. Saramago writes a captivating story of not only social decay, but also the emergence of a new morality in the most desperate circumstances.

An apocalypse is a catastrophic end, but since every end is potentially a new beginning, can't we still look forward to some miracle? Miracles are generally believed to be the mysterious handiwork of some divinity. But let us remember what happens towards the end of Saramago's book when the Doctor's Wife enters a church that has become a refugee camp for the blind. She observes that "all the images in the church had their eyes covered, statues with a white cloth tied around the head, paintings with a thick brushstroke of white paint". The Doctor replies, "Perhaps it was the work of someone whose faith was badly shaken when he realised that he would be blind like the others". The strange alteration of the images perhaps suggests that, just as the world has been struck blind, so too is the Church. God and the saints no longer listen to the pleas of the victims and their simple faith could not cure them. But shortly thereafter, the miracle happens as people slowly begin to regain their sight. The miracle happens because the healing and curative powers associated with the Church and God have been transferred to humanity, when men are empowered to use their own moral and spiritual resources. When humanity becomes divine, we would no longer require to look to a higher power that did not answer our prayers.

> We are such stuf as dreams are made on,
> and our little life is rounded with a sleep.
>
> *– William Shakespeare*

The Lockdown

Saurav Ghosh
Anthropology, 4th Semester

The World is facing severe lockdown state
For which people are in distress
The guilty Coronaviruses are out
So people are in huge doubts
The WHO has remarked to maintain several rules
For rolling Coronavirus away
Ding dong ding
People are recent home's king
As for the first time
They are maintaining their happy families
Stay safe and secure and perform
Your duties to keep India's beauty
Pray to God again and again
To gain the destroying powers of –
Mysterious breakdown afresh.

Life

Mithun Hazra
Office Attendant, Administrative

Life is an endless journey,
Only one can complete it fully.

When there is sun,
Try to feel the sunshine;
You may not get it tomorrow.

Life is a perfect blend of peaks and valleys,
Sometimes soft as a silk;
Sometimes sharp as a knife.

When there is rain,
Try to wash yourself clean;
You may not get it tomorrow.

Life is the change of nature,
This moves with a lot of gesture.

When there is moon light.
Try to enjoy it;
May be you are not getting this moment back.

Life is a riding horse,
If one rides it well;
He will reach his goal, otherwise hell.

When someone cuts a joke,
Try to laugh;
May be you are not getting this moment back.

You can't remain alive for ever,
But you can be immortal;
After all, one can shine only once.

Self

Riya Ghosh
Semester 4, PG Department of English

From the earliness of me
From the encounters with ills and odds
From the fear of confession
From the balm of deception
And dream with faint reality
From a slave of illusion
From over-involvement with the early me
When betrayed by mischievous reflection
When drunk by moment the Lethe of can
From when I thought I could be her,
Friending a deception, under his hat
I could mould my faith at his land
Obscure, could I be brave and mend
The neighbor's wall, and slay
My entity with the Jabberwock lay
And so I thought
And so when I thought I begin to be
And so when I thought I begin another me
I heard a cry, a faint mouring cry.
From the dead end's meet,
From the dark pines of thought's twilight's feet
Inside me does it cry, crawl and creep
Inside me does it grow, groan and grip
Like the cry of Raven, of Owl, of Foul
Like the unheared symphony of Ruth's silent howl,
From the deep and shadow it grows
Like a serpent came it close
For then I thought
For then I feel the cry follow
For then in my ear whisper it 'HOLLOW'...

Shift

Ritwik Bag
English Hons., 2nd Semester

The shift has begun,
Looking past the window
makes much more sense.
Wading through the cold
makes the warmth
succumb to the pain.
The quiet is depressing;
The noises never fail
to scream in shame.
I never found a clue
if this was all I needed
to drive me sane.
I guess I'll never
enjoy the rain again.

Companion

Anuska Mukherjee
Second Semester, English Hons.

We are made up of our own expressions, thoughts, beliefs, emotions and individual status in a society. Louisa aspired to the look at the beautiful world from above the skies whereas Lisa made up her mind to become a social worker. Louisa however did not trust her own sister, she thought Lisa was jealous of her in terms of education. Their life was passing peacefully with enthusiasm and joy every moment. When their journey stopped at the station of ISC exams, Louisa's feeling of jealousy towards her elder sister turned into hatred and eventually Louisa started ignoring Lisa. The whole year went away when at last the results of the exams came out. Louisa had made her way through the exams whereas Lisa scored average marks.

Lisa was happy that her sister has scored well. Louisa said to herself that the road to success and the road to failure are almost exactly the same. When Lisa congratulated her with a small gift, Louisa said, 'See, there was a feeling of hatred in you for me and I know, so Ms Loser, better stay out of my way, you jealous girl and take away this stupid gift. I want to say that stay away from me and the fruits of my success, dear sister.' Lisa was not expecting this kind of behaviour, and started crying hard and ran away from there. Nothing hurts more than being disappointed by the person you love the most in this whole world. Jealousy, hatred, success which easily breaks the strongest relationships. Somewhat this happened between this sisters.

From that day, Lisa went missing. Police were informed and they searched everywhere in Pune but did not find her. Lisa was missing since that day and five days later, an article explained that a body of a girl around 19 years have been recovered from the Vetal Tekdi. The girl had a tattoo in her neck and from this the local people came to know that her name was Lisa Steward. After listening to this Louisa was shocked, she was unable to talk, tears rolled down her cheeks. She quickly ran to Lisa's room and behind the photo of Louisa and Lisa, there was a letter which read :

Dear Louisa,

I know that you hate me, or rather I don't know what misunderstanding has happened . You are a brilliant as well as beautiful girl but Lisa never hate your companion. I don't know what to write, see I am crying. I know when you will get this, I will be already dead, but I will forever be alive in you, my best friend, my classmate, my sister and foremost my 'Strength'. I hope you will remember me. See you, in next life. So bye...

Louisa was unable to believe what had actually happened. She thought may be she was in a nightmare but on pinching she realized it was real. She shouted, throwing all the things, breaking the furniture, she tried to hurt herself but was unable to do so. She cried, she shouted, burnt the books, tore her pictures. All she was doing was to find the solutions to the big mistake she had done. She is unknown from the fact that one the mistake is done its only left to regret it. This what happens to this sisters.

A year later, Louisa was in a Mental Hospital as from that day Louisa has been silent all the time. She has been suffering from bipolar disorder. At times she used to act that Lisa was with her, but sometimes she used to cry and cold sweat appeared on her head and forehead. She felt that she was in a bottomless pit. That letter is still with Louisa and yet nobody came to know about it. The career of Louisa has been destroyed only because of misunderstanding with her own best friend. The pride in Louisa has taken her into such a situation, from where it seems impossible for Louisa to recover. The once excellent girl has turned into a patient in a mental hospital.

باز غ بہاری کی مقصدی شاعری

Dr. M. Imtiaz Ahmed
SACT, Department of Urdu

مفکتیان ادب نے طنز و مزاح کو ادب کے دوسرے درجے کی صنف قرار دیا ہے۔ جبکہ یہ ایک مشکل اور نازک صنف ہے۔ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر حد سے زیادہ شوخی دکھائی تو لکھڑ پن اور ابتذال کا الزام عاید ہو جاتا ہے اور اگر حد سے زیادہ احتیاط برتی تو مضمون بالکل سپاٹ اور بے مزہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ظرافت نگاری بال سے زیادہ باریک رسی پر چلنے کا عمل ہے۔ ذرا سی ڈگمگاہٹ ہوئی اور معیار سے گر گئے۔ درحقیقت اعلا پائے کی ظرافت ایک وہبی عطا ہے۔ جس طرح شاعر پر مضامین غیب سے اترتے ہیں، اسی طرح ظرافت نگار پر مزاحیہ نکتہ فطرت خود منکشف کرتی ہے۔ اسے ہم ''شگفتگی گل'' سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ظریفانہ ادب کا مقصد کسی کو اذیت پہنچانا اور مضحکہ اڑانا نہیں ہوتا۔ نہ ہی یہ محض ہنسنے ہنسانے اور قہقہہ لگانے کے لیے تخلیق کیا جاتا ہے بلکہ معیاری ظریفانہ ادب سوسائٹی کی تشکیل و تعمیر ایک نئے انداز سے کرتا ہے۔ ظریفانہ شاعری بھی معاشرے کی ایک نئے انداز کی تنقید ہے۔ اعلا اور صحت مند ظریفانہ شاعری کے لیے صرف طنز و مزاح کا آمیزہ ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ اس میں فکری عنصر کا ہونا بھی لازمی ہے۔

مذکورہ خیال کی روشنی میں اگر باز غ بہاری کی ظریفانہ شاعری کا جائزہ لیں تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی شاعری میں طنز و مزاح کی آمیزش کے ساتھ فکری جوہر بھی موجود ہے۔ وہ ناصح مشفق کی طرح پند و نصائح اور ترغیب و تلقین کے قائل نہیں بلکہ ''جو دل پر گذرتی ہے'' اسے پوری توانائی کے ساتھ رقم کرتے رہے ہیں۔ ان کا کمالِ فن یہ ہے کہ ان کے ہر شعر میں زورِ طبیعت، بے ساختگی اور روانی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ان کے موضوعات کا دائرہ بھی کم وسیع نہیں کہ وہ کون سا موضوع ہے جو ان کے قلم کی زد میں نہ آیا ہو۔ خواہ وہ معاشرے کی بے اعتدالی ہو یا مغرب کی نقالی، اردو زبان و ادب کی بدحالی ہو یا ٹی وی و فلم کی عریانی، قدروں کی پامالی ہو یا اتحاد و آشتی کی ارزانی۔ گویا ان کی شاعری ان تمام لوازمات سے بھری ہے جو ہمارے زمانے میں نت نئے انداز سے وقوع پذیر ہوتے رہے ہیں اور ہمارے سامنے چولے بدل بدل کر رونما ہوتے رہے ہیں۔ چند اشعار نموناً درج کیے جاتے ہیں :

یہ بیسویں صدی کا نیا انقلاب ہے ۔۔۔ برقع بدن پہ چہرہ مگر بے نقاب ہے
جو پڑھتے تھے کل تک نمازِ تہجد ۔۔۔ وہ اب ویڈیو رات بھر دیکھتے ہیں
جسم کی اب نمائش بھی فیشن میں ہے ۔۔۔ ان کی ساڑی ہے زیرِ کمر دیکھئے
پیور گھی لیے ہم در بدر بھٹکتے ہیں ۔۔۔ مگر دکان پہ لائن ہے ڈالڈا کے لیے
سیلری پائیں اگر چھ سو امام مسجد ۔۔۔ قصد ہوگا رخِ ندوہ کا دوبارہ کس کا
یتیم خانے میں کل شام کو چلو بیگم ۔۔۔ کہ اب تو بچوں کی شدت سے یاد آنے لگی
گاؤں میں وقت پہ ملتی ہی نہیں چیز کوئی ۔۔۔ اور شہروں میں ہر اک جنس کی سپلائی ہے
کرایہ بھیج کے ناقد بلائے جاتے ہیں ۔۔۔ ادب میں بونوں کے جب قد بڑھائے جاتے ہیں

ان اشعار کے حوالے سے اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ باز غ بہاری کا مشاہدہ بہت عمیق اور معاشرے پر ان کی نظر گہری ہے۔

موجودہ دور کے سماجی، سیاسی اور معاشی حالات سے انہیں بھرپور آگاہی حاصل ہے۔ اس ماحول میں جو کچھ ہو رہا ہے، اسے نہ صرف وہ شدّت سے محسوس کرتے ہیں، بلکہ ماہرانہ انداز میں اسے پیش بھی کرتے ہیں۔ عصر حاضر کے وہ مسائل جنھوں نے ہماری زندگی میں ایک بحران اور اتھل پتھل پیدا کر دی ہے اور زندگی کا حقیقی سکون ہم سے چھین لیا ہے، انہیں فن کاری کے ساتھ اپنے اشعار کے قالب میں یوں ڈھالتے ہیں کہ ہم قہقہہ لگائے بغیر نہیں رہ پاتے بلکہ اکثر اوقات ان کی شاعری، بالخصوص نظموں سے گذرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ پہلے زیرِ لب تبسم کی کیفیت پیدا ہوئی پھر اچانک غور کرنے پر ایک جھٹکا (Shock) محسوس ہوا اور ذہن سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ باز غ صاحب کس حسین پیرائے میں ہنستے ہنساتے ہمیں (Shock) دے گئے۔ ایسی شاعری کو ہم Sugar Coted بھی کہہ سکتے ہیں کہ ترش و تلخ اور کڑوی گولی کو شکر میں لپیٹ کر اس طرح مریض کو دیا جائے کہ مریض اس کی تلخی کے احساس کے بغیر آسانی سے گولی کو حلق سے نیچے اتار لے اور اس طرح اس کا مرض جاتا رہے۔ ایسا ہی کام باز غ بہاری کی شاعری نے ہمارے معاشرے کے لیے کیا ہے جو قابلِ تحسین ہے۔ ان کی وہ نظمیں جو بظاہر چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن قوتِ تاثیر سے بھرپور ہیں اور ہمیں دعوتِ غور و فکر بھی دیتی ہیں۔ خودکشی، آدرش، آدمی کی خاصیت، کھانسی اور شراب، لپ اسٹک، برقع وغیرہ ایسی مختصر نظمیں ہیں جو ہمیں نہ صرف انبساط و اہتزاز فراہم کرتی ہیں بلکہ ورطۂ تخیّل میں ڈال دیتی ہیں۔ نظم

''الکشن کی بہار'' کے دوؔ بند ملاحظہ ہوں:

رابرٹ ہے، شرفو ہے نہ پربھو ہے یہ اردو
سکھ ہے نہ مسلماں ہے نہ ھندو ہے یہ اردو
اک ضربِ دور بام من و تو ہے یہ اردو
ہر جذبۂ تعمیر سے مملُو ہے یہ اردو
بنواؤں گا ایک شیش محل بعد الکشن
اور نام سے اردو کے کراؤں گا معنون

تسلیم مجھے شہر میں پانی کا ہے فقدان
ہر گاؤں ہی آتا ہے نظر حشر کا میدان
اب مجھ پہ بھروسہ کریں سکھ ہندو مسلمان
وعدہ ہے مرا آپ سے یہ برسرِ اعلان
ہر گھر میں گھسادوں گا سمندر کی روانی
بھگوان قسم سب کو پلادوں گا میں پانی

''آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے'' کے یہ مصرعے بھی دیکھیں!

جو یوم کرسمس کی تقریب ہے روایاتِ یورپ کی ترغیب ہے
مرے گھر میں انگریزی تہذیب ہے ہوا ہے جو بیٹا مرا بی اے پاس

یا پھر نظم ،۲۶ رجنوری کا یہ بند :

جامِ شراب ہاتھ میں لے کر یہ گنگنا چولھے کے بھاڑ میں گئی پرکھوں کی آستھا
یہ یادگار دن ہے اسے اس طرح بنا بوتل میں ڈوب کر غم دنیا کو بھول جا
بھگوان کو بھی بھول جا اتنی شراب پی
چھبیس جنوری ہے یہ چھبیس جنوری

ان کی نظموں میں ایسی مثالیں جابجا ملتی ہیں جن میں مزاح کے ساتھ طنز اور طنز کے ساتھ فکری عناصر کی کارفرمائی ہے۔

اس طرح نظموں سے ہٹ کر دوہے، ماہیے یا رباعیات پر نظر کریں تو وہاں بھی طنز ومزاح کی شوخ وشنگ لہریں ساحلِ ذہن سے ٹکراتی ہوئی ملیں گی جہاں اس چھینٹوں سے ہم کبھی لطف اندوز ہوں گے اور کبھی اس کے تھپیڑوں سے ہمارا پورا وجود ہی شرابور ہو جائے گا۔

مختصر یہ کہ بازغ بہاری کی شاعری نے اس دور میں ایسا کام ہے جو کم آسان نہیں۔اس دوڑتی بھاگتی اور مشینی زندگی میں ہم ہنسنا بھول گئے ہیں اور ہنسی فراہم کرنا کوئی دل لگی نہیں۔اسی لیے تو فخریہ انداز میں بازغ صاحب یہ کہتے نظر آتے ہیں :

طنز و تبسم اور ظرافت زندہ باد
سجنے لگے ہیں سوکھے لب مسکانوں سے!